

ছায়ামূর্তি

রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

ছায়ামূর্তি-৬

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

প্রচ্ছদ ঃ সুখেন দাস

নতুন সংস্করণ ঃ মার্চ, ১৯৯৮ ইং

পরিবেশনায় ঃ
বাদল ব্রাদার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি. কে. দাস রোড
নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ৪৫টাকা

উৎসর্গ

আমার প্রাণ প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

পরদিন ভোর হবার সংগে সংগে পুলিশমহলে সাড়া পড়ে গেল। একরাতে জোড়া খুন। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের অদ্ভুত মৃত্যু এবং বণিক ভগবৎ সিংয়ের রহস্যময় হত্যা-গোটা শহরে একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। আগের দিনই চৌধুরী সাহেবের অকস্মাৎ মৃত্যু শহরবাসীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। পর পর দু'দিনে তিনটি খুন সবাইকে ভাবিয়ে তুলল।

মিঃ জাফরী নিজে গেলেন এই খুনের তদন্তে। সংগে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম রয়েছেন। আর রয়েছেন কয়েকজন পুলিশ।

ডাক্তার সেনের বাড়িতে পৌঁছতেই তাঁর পুত্র হেমন্ত সেন উদভ্রান্তের মত ছুটে এলেন, মিঃ হারুনকে তিনি চিনতেন, তাঁর হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়লেন— আমার বাবার হত্যাকারীকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত শাস্তি দিন ইন্সপেক্টার সাহেব! শাস্তি দিন।

মিঃ হারুন সান্ত্বনার স্বরে বললেন— আপনি শান্ত হোন মিঃ সেন, আপনার পিতার হত্যাকারীকে আমরা খুঁজে বের করবোই এবং তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে------

মিঃ জাফরী লাশ তদন্ত করে আশ্চর্য হলেন। খোলা ছাদে তাঁকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি অবাক হলেন—গভীর রাতে ডাক্তার জয়ন্ত সেন ছাদে কেন এসেছিলেন? তাঁকে জোর করে এখানে আনা হয়েছিল না তিনি নিজেই এসেছিলেন? ডাক্তার জয়ন্ত সেনের শোবার ঘর পরীক্ষা করে দেখলেন, ঘরের একটা জিনিসও এদিক-সেদিক হয়নি। এমনকি বিছানাটাও এলোমেলো হয়নি।

ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যাকারী যে শুধু তাঁকে হত্যা করতেই এসেছিল এটা সত্য। কেননা টাকা-পয়সা বা কোনো জিনিসপত্র চুরি যায়নি।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করেও পুলিশ অফিসারগণ এ হত্যারহস্যের কোনো কিনারায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন না।

মিঃ জাফরী পরীক্ষাকার্য শেষ করে ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হলঘরে গিয়ে বসলেন। তিনি হেমন্ত সেনকে লক্ষ্য করে বললেন—আমি আপনাদের বাড়ির সবাইকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

হেমন্ত সেন উত্তর দিলেন—করুন।

হেমন্ত সেনের বাড়িতে তেমন বেশি লোকজন ছিল না। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের স্ত্রী অনেকদিন আগে মারা গেছেন। একমাত্র পুত্র হেমন্ত সেন, তাঁর স্ত্রী নমিতা দেবী আর শিশু পুত্র কুন্তল। ড্রাইভার রজত এবং দারোয়ান গুরু সিং— মোটামুটি এই নিয়ে ডাক্তার সেনের সংসার। আর ছিলেন ডাক্তার জয়ন্ত সেনের কম্পাউন্ডার নিমাই বাবু।

সবাইকে হলঘরে ডাকলেন হেমন্ত সেন।

মিঃ জাফরী নিজে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি হেমন্ত সেনকেই প্রশ্ন করলেন— আপনার বাবার হত্যা ব্যাপারে আপনি কতটুকু জানেন হেমন্তবাবু?

কিছুই না। আমার বাবার হত্যা ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

কাল রাতে আপনার বাবা কখন শোবার ঘরে গিয়েছিলেন, বলতে পারেন নিশ্চয়ই?

না স্যার। কারণ আমি কাল অনেক রাতে বাসায় ফিরেছি।

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?

আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে। আমি সেখান থেকে যখন ফিরে আসি তখন বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছিল কিন্তু আমি তখনও বাবার ঘরে আলো দেখেছি। আমার মনে হল বাবা তখনও ঘুমোননি।

আপনি এরপর কতক্ষণ জেগেছিলেন?

বেশি সময় জাগতে পারিনি। কারণ আত্মীয়ের বাড়ি থেকে ফিরে সারা দিনের ক্লান্তিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ি।

রাতে কোন শব্দ পাননি? কোনোরকম গোঙানি বা আর্তচিৎকার?

না। তবে আমাদের দারোয়ান গুরু সিং ছাদের সিঁড়ি বেয়ে একটা ছায়ামূর্তিকে নেমে যেতে দেখেছে।

আচ্ছা, আপনার স্ত্রীকে আমি এবার প্রশ্ন করব।

বেশ, করুন।

আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল নমিতা দেবী, এগিয়ে এলো।

মিঃ জাফরী তাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনার শ্বশুর ডাক্তার জয়ন্ত সেনের হত্যা সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

না। তাঁর হত্যা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। তবে এটুকু জানি, আমার শ্বশুর গত দু'দিন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তাঁকে সব সময় খুব উদ্বিগ্ন মনে হত। নমিতা দেবী স্বচ্ছ স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা কয়টি বলে গেল।

পুলিশ অফিসাররা নিশ্চুপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। একপাশে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম বসে রয়েছেন।

নমিতা দেবীর কথায় মিঃ আলমের মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে উঠল। চোখ দুটোও কেমন যেন ধক করে জ্বলে ওঠে নিভে গেল।

আর কেউ মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য না করলেও মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন। তিনি মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বললেন— মিঃ আলম, আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার জয়ন্ত সেন তাঁর নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছিলেন?

না ইন্সপেক্টর সাহেব, ডক্টর সেন তাঁর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই টের পাননি। তিনি এমন কোন কাজ করে বসেছিলেন— যে কাজের জন্য তিনি শুধু উদ্বিগ্ন না, অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। মিঃ আলম গম্ভীর শান্তকণ্ঠে কথাগুলো বললেন।

মিঃ হারুন বললেন— মিঃ আলমের চিন্তাধারা নির্ঘাৎ সত্যি। নমিতা দেবীর কথায় সেরকমই মনে হয়।

মিঃ জাফরী ড্রাইভার রজত এবং কম্পাউন্ডার নিমাই বাবুকে প্রশ্ন করে তেমন কোনো সন্তোষজনক জবাব পেলেন না। দারোয়ান গুরু সিং এলো এবার মিঃ জাফরীর সম্মুখে। লম্বা সালাম ঠুকে দাঁড়াল এক পাশে।

মিঃ জাফরী জিজ্ঞাসা করলেন— তোমার নাম গুরু সিং?

হ্যাঁ হুজুর, আমার নাম গুরু সিং। আমিই তো দেখেছি হুজুর।

কি দেখেছ? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

সেই ছায়ামূর্তি হুজুর।

ছায়ামূর্তি?

হ্যাঁ হুজুর, যে ডাক্তারবাবুকে গলা টিপে হত্যা করেছে।

ধমকে ওঠেন মিঃ হারুন— তুমি কি করে জানলে সেই ছায়ামূর্তি ডাক্তার বাবুকে হত্যা করেছে?

সেই ছায়ামূর্তি ছাড়া কেউ ডাক্তারবাবুকে হত্যা করেনি হুজুর, একথা আমি ঠাকুর দেবতার দিব্য করে বলতে পারি।

মিঃ জাফরী বললেন— তুমি তখন কোথায় ছিলে?

হুজুর গেটের পাশের খুপ্‌ড়িতে। গভীর রাতে হঠাৎ পায়ের শব্দে তাকিয়ে দেখি দোতলার সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। আমি চিৎকার করে উঠি—চোর—চোর কিন্তু হুজুর আশ্চর্য! ছায়ামূর্তি কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল। আমার চিৎকারে কারও ঘুম ভাঙলো না। আমি তখন কাউকে না ডেকে নিজেই উপরে উঠে গেলাম। ঘুরেফিরে দেখলাম সব দরজা বন্ধ রয়েছে। এমন কি ডাক্তারবাবুর

ঘরের দরজাও বন্ধ। তখন নিশ্চিন্ত মনে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। তারপর একটু শুয়ে পড়েছি। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি হুজুর, ভোরে চাকর ছোকরাটার ধাক্কায় ঘুম ভাঙলো, শুনলাম সে ভয়ার্ত গলায় বলছে, গুরু সিং, গুরু সিং, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন, ডাক্তারবাবু খুন হয়েছেন। আমি চোখ রগড়াতে রগড়াতে ছুটলাম উপরে। তারপর গিয়ে দেখি— ডাক্তারবাবু ছাদে পড়ে আছেন। তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই কান্না কাটি শুরু করেছে।

যাক, আর তোমাকে বলতে হবে না। ডাক্তারবাবু হত্যা সম্বন্ধে এ বাড়ির সকলের চাইতে তুমিই বেশি জান দেখছি। তারপর মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী বললেন— একেও থানায় নিয়ে চলুন। কয়েক ঘা খেলেই দোষ আছে কিনা বেরিয়ে পড়বে। এ নিশ্চয়ই ডাক্তার সেনের হত্যা সম্বন্ধে জ্ঞাত আছে।

হেমন্ত সেনের কথাও শুনলেন না মিঃ জাফরী, দারোয়ান গুরু সিংয়ের হাতে হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

এবার মিঃ জাফরী দলবলসহ চললেন বণিক ভগবৎ সিংয়ের বাড়িতে। ভগবৎ সিংয়ের বাড়িতে পৌছে অবাক হলেন মিঃ জাফরী। এত বড় বাড়িতে মাত্র ক'জন লোক। একজন মহিলা দাসী, একজন চাকর। এছাড়া একজন বয়স্ক লোক, তিনি নাকি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় হন।

ভগবৎ সিং খুন হয়েছেন তাঁর শোবার ঘরে। বিছানায় অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ভগবৎ সিং। জমাট রক্তে বিছানার কিছুটা অংশ কালো হয়ে উঠেছে। কতগুলো মাছি বন বন করে উড়ছিল সেখানে। একখানা সুতীক্ষ্ণধার ছোরা অমূল বিদ্ধ হয়ে আছে ভগবৎ সিংয়ের বুকে।

গতকালই যে ভদ্রলোক তাঁদের সঙ্গে এত মহৎ ব্যবহার করেছেন—আর আজ তাঁর এ অবস্থা। পুলিশ অফিসার হলেও হৃদয় তো একটা ব্যথায় ছোঁয়া লাগল সকলের মনে।

মিঃ জাফরী নিজ হাতে ভগবৎ সিংয়ের বুক থেকে ছোরাখানা টেনে তুলে নিলেন। তারপর স্তব্ধকণ্ঠে বললেন— অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড। হত্যার হিড়িক পড়ে গেছে যেন।

মিঃ হারুন বলেন— এ তিনটা হত্যাকাণ্ডই অত্যন্ত রহস্যময়। মিঃ চৌধুরীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা, ডাক্তার জয়ন্ত সেনকে গলা টিপে মেরে ফেলা— আর ভগবৎ সিংকে ছোরাবিদ্ধ করা।

মিঃ শঙ্কর রাও গভীরভাবে চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন এবার— এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক। যদিও বিভিন্ন রূপে এই হত্যাকাণ্ডগুলো সংঘটিত হয়েছে।

মিঃ আলম একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বলেন এ তিন ব্যক্তির হত্যাকারী এক নাও হতে পারে, কিন্তু এ তিন ব্যক্তির হত্যারহস্যের যোগসূত্র এক বলে মনে হচ্ছে।

মিঃ জাফরী তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে, শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে তাঁর মুখ থেকে— হুঁ!

মিঃ জাফরী লাশ পরীক্ষা করা শেষ করে ডাকলেন ভগবৎ সিংয়ের বাড়ির তিন ব্যক্তিকে। প্রথমে তিনি ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় ভদ্রলোককে প্রশ্ন করলেন।

ভদ্রলোক ভগবৎ সিংয়ের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না।

দাসীও জানাল কিছু জানে না এ ব্যাপারে সে।

কিন্তু চাকর রঘু বলল—সাহেব, আমি কাল রাতে যখন ঘুমিয়েছিলাম হঠাৎ একটা অর্তনাদে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল, আমার মনে হল মালিকের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে। আমি একটুও দেরী না করে ছুটলাম মালিকের ঘরের দিকে। কিন্তু ঘরের দরজায় পৌছে দেখলাম দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। আমি ছুটে গেলাম ওদিকের জানালার ধারে ভাবলাম, ঐদিক দিয়ে মালিকের ঘরের মধ্যে কেউ ঢুকলে দেখতে পাব —কিন্তু সাহেব, কি দেখলাম— এখনও ভাবলে আমার গা শিউরে ওঠে, আমি যেমনি জানালার পাশে এসে ভিতরে উঁকি দিতে যাব, অমনি ঘরের ভিতর থেকে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুই কি করলি? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

আমি কি করব, থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করতে লাগল। কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর হুঁশ হল। তখন ঘরের ভিতরে কোন শব্দ হচ্ছে না, আমি জানালা দিয়ে ভিতরটা দেখবার চেষ্টা করলাম। ঘরে আলো জ্বলছিল। সাহেব, যা দেখলাম— কি আর বলব মালিক বিছানার উপরে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা বিছানাটা। আমি দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললাম, তারপর চিৎকার করে ছুটে গেলাম ওনার ঘরে--রঘু আঙ্গুল দিয়ে ভগবৎ সিংয়ের আত্মীয় ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে দিল। তারপর আবার বলতে শুরু করল— গিয়ে দেখি উনি ঘরে নেই--

ঘরে নেই। অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন মিঃ জাফরী। একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন ভদ্রলোকটার দিকে— ওর কথা সত্য? আপনি তখন ঘরে ছিলেন না?

ভদ্রলোকের দাড়িগোঁফ ঢাকা মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয় কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন তিনি— বড্ড গরম লাগছিল তাই একটু খোলা ছাদে গিয়েছিলাম--

খোলা ছাদে গিয়েছিলেন, অথচ একটু আগে বললেন, আপনি নাকি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। গম্ভীর কণ্ঠস্বর মিঃ জাফরীর।

এখনও বলছি আমি এ হত্যা সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কারণ নিচের কোন শব্দই উপরে পৌঁছে না।

তাহলে কখন আপনি নিচে নেমে আসেন এবং ভগবৎ সিংয়ের মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন? প্রশ্ন করলেন মিঃ জাফরী।

ভদ্রলোক ঢোক গিলে বললেন—আমি নিজের ঘরে এসে যখন বিছানায় শুতে যাব, সেই সময় রঘুর চিৎকার আমার কানে যায়।

তার পূর্বে আপনি রঘুর চিৎকার শুনতে পাননি?

না, অবশ্য তার আর একটা কারণ ছিল।

বলুন?

রঘু আমাকে ঘরে না দেখে বাইরের লোকজনকে ডাকতে গিয়েছিল। পথের দু'চারজন লোককে নিয়ে রঘু এসে আবার চিৎকার করতে শুরু করে দিল তখন আমি শুনতে পাই।

গম্ভীর কণ্ঠে শব্দ করলেন— মিঃ জাফরী -হুঁ। আশ্চর্য বটে, টের পেলেন না।

সত্যি বলছি এমন একটা কিছু ঘটবে আমি ধারণা করতে পারিনি।

আপনার নামটা যেন কি বলেছিলেন? আমি ভুলে গেছি। জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ জাফরী।

কক্ষে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। শুধু মিঃ জাফরী প্রশ্ন করে চলেছেন।

ভদ্রলোক বললেন— আমার নাম জয় সিং।

এবার মিঃ জাফরী দাসীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন— তুমিও তো কিছুই জান না। কিন্তু তুমি ঠিক ভগবৎ সিংয়ের পাশের ঘরেই ঘুমিয়েছিলে, তাইনা?

তা ছিলাম। বুড়ো মানুষ সারাটা দিন খেটেখুটে শুয়েছি, অমনি ঘুমিয়ে পড়েছি। তাই হুজুর, আমি মালিকের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারিনি। মালিক বড় ভাল লোক ছিলেন হুজুর। তিনি আমার মা বাপ। কাঁদতে শুরু করে দাসী। একবার তাকায় জয় সিংয়ের মুখের দিকে।

হঠাৎ শঙ্কর রাও বললেন —একে যেন আমি কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। গলার স্বরটাও যেন শুনেছি।

বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে বলে— তা দেখবেন হুজুর, আমি সব সময় লোকের বাড়িতে কাজ করি না।

মিঃ আলম এবার কথা বললেন— মিঃ রাও, আপনি ভাল করে স্মরণ করে দেখুন ওকে কোথায় দেখেছিলেন?

ঠিক মনে পড়ছে না।

গভীরভাবে চিন্তা করুন।

মিঃ রাও বুড়ীর মুখের দিকে তাকালেন, বুড়ী মুখটা ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

মিঃ আলম কঠিন কণ্ঠে বললেন— এই দিকে মুখ করে দাঁড়াও।

তারপর মিঃ জাফরকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার, একে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।

মিঃ জাফরী বলেন স্বচ্ছন্দে করুন মিঃ আলম।

মিঃ আলম এবার বুড়ীকে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন—তোমার নাম কি?

আমার নাম, আমার নাম তো তেমন কিছুই নেই। সবাই আমাকে 'মাসী' বলে ডাকে।

তা ডাকুক, তোমার নাম শুনতে চাচ্ছি?

নাম··এবার বুড়ী তাকালো জয় সিংয়ের মুখে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হল। বুড়ী আবার ঢোক গিলে বলল— আমাকে ছোটবেলায় সবাই 'সই' বলে ডাকত।

গর্জে উঠলেন মিঃ আলম— মিথ্যে কথা! তোমার সঠিক নাম শুনতে চাই।

মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিঃ আলমের বজ্র কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। তাঁরা সবাই তাকালেন মিঃ আলমের মুখের দিকে।

মিঃ আলমের সুন্দর মুখমণ্ডল রাগে রক্তাভ হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটিতে যেন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন— জান মিথ্যার শাস্তি কি? এ মুহূর্তে আমি তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

বুড়ীর মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। অসহায় দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকাচ্ছে সে জয়সিংয়ের দিকে, আর একবার তাকাচ্ছে মিঃ আলমের চোখ দুটোর দিকে। জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দু'খানা বারবার চেটে নিচ্ছে।

বুড়ীর মুখ দেখেই মনে হচ্ছে, ওর মনের মধ্যে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়েছে। মিঃ আলমের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুড়ী শিউরে ওঠে কম্পিত কণ্ঠে বলে— আমার নাম সতী দেবী ···

হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। তুমি—তুমিই সেই সতী দেবী, যাকে দস্যু নাথুরামের ওখানে দেখেছিলাম। সেই সতী দেবী তুমি ---- এখানে কেন --- এখানে কেন তুমি? শঙ্কর রাও এবার বুড়ীর ওপর রেগে ফেটে পড়লেন।

কক্ষের সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছেন। মিঃ জাফরীর দু'চোখেও বিস্ময়।

মিঃ হারুনের মুখোভাব কঠিন হয়ে উঠেছে।

মিঃ আলমের মুখমণ্ডল পূর্বের চেয়ে অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তিনি মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বললেন— এই স্মরণশক্তি নিয়ে আপনি গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছেন!

মিঃ আলম যদিও তাঁর বন্ধুলোক তবুও তাঁর কথায় লজ্জিত হলেন মিঃ রাও।

মিঃ আলম মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার, আমি জয়সিংকে অ্যারেস্ট করার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—আমারও সেই মত।

মিঃ হারুন পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন জয় সিংয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে।

সতী দেবীর হাতেও হাতকড়া লাগিয়ে দেয়া হল।

জয় সিং প্রায় কেঁদেই ফেললেন—আমাকে বিনা অপরাধে এভাবে অপমানিত করছেন কেন?

মিঃ আলম বললেন, তার জবাব পাবেন বিচারের পরে। এবার তিনি মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন— স্যার ,লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে একজন ক্যামেরাম্যানের আবশ্যক। ভগবৎ সিংয়ের ছবি রাখা দরকার।

মিঃ জাফরী অবাক হলেও মনোভাব প্রকাশ না করে ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

মৃত ভগবৎ সিংয়ের ফটো নেয়া হল। পর পর দুটো।

মিঃ আলম এবার মৃতের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন— আপনারা সবাই ভগবৎ সিংয়ের যে রূপ দেখতে পাচ্ছেন সেটা তার আসল চেহারা নয়।

কক্ষের সবাই অবাক হলেন। মিঃ জাফরী বললেন— কি বলছেন মিঃ আলম!

হ্যাঁ দেখুন। মিঃ আলম মৃত ভগবৎ সিংয়ের মুখ থেকে গোঁফ জোড়া খুলে নিলেন। কপালের ওপরের কিছুটা চুল টেনে তুলে ফেললেন।

মিঃ হারুন তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন এ যে ডাকু নাথুরাম। সর্বনাশ, আমরা এতদিনেও একে চিনতে পারিনি।

মিঃ জাফরী বললেন— এই সেই নাথুরাম? দস্যু নাথুরাম।

হ্যাঁ স্যার। আমাদের ডায়েরীতে এর নাম এবং ফটো আছে। বড় শয়তান— দুর্দান্ত ডাকু। কথাটা বললেন মিঃ হারুন।

শঙ্কর রাও যেন খুশি হলেন না। তিনি রাগে গস্ গস্ করে বললেন— বেটা আমাকে যা ভুগিয়েছিল। বেঁচে থাকলে আমি ওকে ফাঁসি দিয়ে, তবে ছাড়তাম।

মিঃ হারুন মিঃ আলমকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন— আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ আলম। ভগবৎ সিংয়ের আসল পরিচয় উদঘাটিত না হলে একটা জটিল রহস্য অন্ধকারের আড়ালে চাপা পড়ে যেত। ডাকু নাথুরামের ছদ্মাবেশে এবং তার এই ভয়ঙ্কর পরিণতি আমরা কেউ জানতে সক্ষম হতাম না।

মিঃ জাফরীও মিঃ আলমের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল খুব প্রসন্ন বলে মনে হল না। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— এই হত্যা রহস্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠল। জানি না এর সমাপ্তি কোথায়।

লাশ মর্গে পাঠানোর পূর্বে নাথুরামের আরও দুখানা ফটো নেয়া হল।

মিঃ জাফরী দলবলসহ জয় সিং এবং সতী দেবীকে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশ অফিসে নিয়ে চললেন।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য আরও জটিল হয়ে উঠল।

বালিশে মুখ গুঁজে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল বনহুর। আজ ক'দিন থেকে একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে সে। নিজ অনুচরদের সঙ্গে পর্যন্ত তেমন করে আর কথা বলে না।

হঠাৎ দস্যু বনহুরের হল কি?

অনুচরদের মধ্যে এ নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু হল। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলার সাহস পেল না।

নূরীও কম বিস্মিত হয়নি, বনহুরকে সে এই প্রথম নীরবে অশ্রু বিসর্জন করতে দেখল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের বিশ্রামকক্ষে নিশ্চুপ শুয়েছিল বনহুর। নূরী ধীর পদক্ষেপে তার পাশে গিয়ে বসল। বনহুরের চুলের ফাঁকে আংগুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—হুর, কি হয়েছে তোমার?

নূরীর কোমল স্পর্শে বনহুর মুখ তুলে তাকাল। দু'চোখে তার অশ্রুর বন্যা। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল হুর আমার কাছে কিছুই অজানা নেই। বলো, কি হল তোমার?

নূরী, কি বলব, আজ আমার মত দুঃখী কেউ নেই।

কি হয়েছে বল?

ছোটবেলায় আম্মা-আব্বার স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁদের অপরিসীম আশীর্বাদ থেকে কোনোদিন বঞ্চিত হয়নি। আজ তাও হারিয়েছি। আমার ....আমার আব্বা আর বেঁচে নেই।

তোমার আব্বা! বিস্মিত কণ্ঠস্বর নূরীর।

হ্যাঁ, আমার আব্বা। নূরী তোমার কাছে আমি বড় অপরাধী।

ছিঃ ও কথা বল না হুর। আমিই যে তোমার কাছে চির অপরাধী। কত মহৎ তুমি, তাই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ..

শোনো নূরী, আমার আব্বা-আম্মা উভয়েই বেঁচে ছিলেন এতদিন।

বেঁচে ছিলেন?

হ্যাঁ নূরী।

কেন তবে যাওনি তুমি তাঁদের কাছে?

আমি তাঁদের অপরাধী সন্তান। আমি তাঁদের বংশের কলংক অভিশাপ। তাই সন্তান হয়েও পুত্রের দাবী নিয়ে কোনোদিন তাঁদের সম্মুখে দাঁড়াবার সাহস পাইনি, পিতার মৃত্যুকালে বুক ফেটে গেছে, কিন্তু আব্বা বলে ডাকবার সুযোগ পাইনি; নূরী, আমি যে তাঁদের অভিশপ্ত সন্তান। ছোট্ট বালকের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বনহুর।

নূরীও কেঁদে ফেলে, বনহুরের চোখের পানি নূরীর হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে। বনহুরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে তার।

নূরী ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

এমন সময় বাইরে পদশব্দ শোনা যায়। নূরী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—কে?

আমি মহসীন। দরজার বাইরে থেকে কথাটা ভেসে আসে।

নূরী বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— হুর, মহসীন তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়। ওঠো।

বনহুর উঠে বসে। নূরী নিজের আঁচল দিয়ে বনহুরের চোখের পানি মুছিয়ে দিয়ে বলে— মহসীন তোমায় ডাকছে।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে বনহুর— আসতে বল। নিজের চোখমুখ হাতের তালুতে ঘসে স্বাভাবিক করে নেয় সে।

মহসীন কুর্ণিশ করে দাঁড়ায়।

বনহুর বলল— কাসেমের সন্ধান পেয়েছ?

না সর্দার। যারা ওর সন্ধানে গিয়েছিল, সবাই ফিরে এসেছে। সর্দার, আমার মনে হয় ও নেকলেসটার লোভ সামলাতে পারেনি। ফেরত দিতে গিয়ে আত্মসাৎ করে পালিয়েছে।

আমি তো জানি এত সাহস ওর হবে না।

সর্দার, তাহলে সে রয়েছে কোথায়?

ধরা পড়ে যায়নি তো?

না সর্দার। আমরা গোপনে সব জায়গায় সন্ধান নিয়ে দেখেছি।

এমন সময় রহমতের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়— সর্দার, কাসেম এসেছে।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল দরজার দিকে, বলল—নিয়ে এসো।

রহমতের পেছনে নতমুখে কাসেম এসে দাঁড়াল।

বনহুর নূরীকে বলল— নূরী, তুমি যাও, বিশ্রাম করোগে।

নূরী চলে গেল।

বনহুর অগ্নিদৃষ্টি মেলে তাকাল কাসেমের দিকে। কে মনে করবে এই সেই বনহুর, যে একটু পূর্বেই পিতৃশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। বনহুরের দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হয়। গম্ভীর কণ্ঠে গর্জে ওঠে—কাসেম!

সর্দার!

খবর কি তোমার?

সর্দার ...

কোথায় গুম হয়েছিলে?

সর্দার, আমি নেকলেসখানা..

বল থামলে কেন?

সর্দার নেকলেস আমি ফেরত দিতে পারিনি।

তার মানে?

আমি তাকে খুঁজে পাইনি সর্দার।

খুঁজে পাওনি! তাই আত্মগোপন করে থাকতে চেয়েছিলে?

মাফ করবেন, আমি আপনার সামনে আসার সাহস পাইনি।

আজ তবে কেমন করে সাহস হল?

রহমত বলে ওঠে— সর্দার, আমি নারন্দি থেকে ফিরে আসার সময় কান্দাইয়ের বনের নিকটে ওকে দেখতে পাই। ও আমাকে দেখে চোরের মত পালাতে যাচ্ছিল। আমি ওকে ধরে আনি।

বনহুর হুঙ্কার ছাড়ে— এ কথা সত্যি?

পালাচ্ছিলাম সত্য, কিন্তু কিছু আমি চুরি করিনি।

নেকলেসখানা কি করেছ?

আমার কাছেই আছে। এই যে সর্দার। ফতুয়ারা পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করে বনহুরের সম্মুখে মেলে ধরে—আমি তাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হয়ে গেছি—তাই নেকলেসটা আমার কাছেই রয়েছে।

বনহুর কিছু বলার পূর্বে মহসীন বলে ওঠে— সর্দার, কাসেম যা বলছে সত্য নয়। এখন ধরা পড়ে সাধু সেজেছে।

গর্জে ওঠে বনহুর—চুপ কর মহসীন। কাসেম যা বলছে মিথ্যা নয়।

সর্দার! আনন্দধ্বনি করে ওঠে কাসেম। দু'চোখে তার কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ে। এতদিন যাঁর ভয়ে সে বন হতে বনান্তরে, শহরে, গ্রামে লুকিয়ে লুকিয়ে ফিরেছে— তিনি স্বয়ং তার পক্ষে। আনন্দ উপচে পড়ল কাসেমের মুখমণ্ডলে।

বনহুর কাসেমের হাত থেকে নেকলেস ছঁড়া হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলল যাও কাজে যোগ দাও।

কাসেম এবং মহসীন বেরিয়ে গেল।

বনহুর রহমতকে লক্ষ্য করে বললো— রহমত, সেই অন্ধ রাজার খবর কি?

খবর ভাল। তাঁকে তাঁর ছোট ভাই বন্দী করবার ফন্দি এঁটেছিলো, আমি তা নষ্ট করে দিয়েছি।

কিভাবে এ কাজ করলে তুমি?

আমি তাঁর সেই দলিল চুরি করে এনেছি। কাজেই আদালতে বিনা বিচারে অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন খালাস পেয়ে গেছেন।

একথা তুমি তো জানাওনি রহমত?

সর্দার, ক'দিন আপনার সাক্ষাৎ কামনায় ঘুরেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি।

দলিলখানা তোমার কাছে আছে?

আছে সর্দার!

ওটা আমাকে দিয়ে যাও। সময়ে প্রয়োজন হতে পারে।

জামার ভেতর থেকে একটা লম্বা ধরনের কাগজ বের করে বনহুরের হাতে দেয় রহমত।

বনহুর একটু দৃষ্টি বুলিয়ে পুনরায় ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলে— বেচারা মোহন্ত তাহলে উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন—

আপনারই দয়ায় সর্দার।

না, রহমত, এটা তোমার সৌজন্যতায়।

আপনি হুকুম না করলে আমি কি যেতে পারতাম সর্দার? কিন্তু এখনও অন্ধ রাজা মোহন্ত সেন নিরাপদ নয়।

তা জানি। কিন্তু উপস্থিত আমি একটা মহাসংকটময় অবস্থায় উপনীত হয়েছি রহমত--- যা ,একটু অবসর পেলেই আমি মোহন্ত সেনের ছোটভাই রাজা যতীন্দ্র সেনকে দেখে নেব। আচ্ছা, এখন যাও রহমত।

রহমত দরজার দিকে পা বাড়াতেই পিছু ডাকে বনহুর— শোনো, এই নেকলেস ছড়া তুমি.... না না থাক, আমিই পৌছে দেব। যাও।

রহমত বেরিয়ে যায়।

বনহুর নেকলেস ছড়া প্যান্টের পকেটে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

❑

সাদা চুনকাম করা বিরাট দোতলা বাড়ি। যদিও বহুদিন বাড়িখানায় নতুন রঙের ছোঁয়া লাগেনি তবু দূর থেকে বাড়িখানাকে ধোপার ধোয়া কাপড়ের মতই সাদা ধবধবে লাগে।

মাঝে মাঝে চুন-বালি-খসে পড়েছে, কোথাও বা শেওলা ধরে কালচে রং হয়েছে, কিন্তু জোস্নাভরা রাতে এসব কিছুই নজরে পড়ে না। বাড়ির সম্মুখে রেলিং ঘেরা চওড়া বারান্দা। বারান্দার নিচেই লাল কাঁকর বিছানো সরুপথ।

বাড়িখানা কোন শহরে নয়, গ্রামে।

বাড়ির মালিক বিনয় সেন, মধু সেনের বাবা।

গভীর রাত।

সমস্ত বাড়িখানা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে।

আকাশে অসংখ্য তারার মেলা। তারই মাঝে ষোড়শী চাঁদ হাসছে। বাড়ির পেছনে আমবাগান। জোস্নার আলো তাই বাড়ির পেছনটাকে আলোকিত করতে সক্ষম হয়নি।

অন্ধকারে আত্মগোপন করে বনহুর এসে দাঁড়াল প্রাচীরের পাশে। অতি সন্তর্পণে উঠে দাঁড়াল প্রাচীরের ওপর।

নিঝুমপুরীর মত বাড়িখানা ঝিমিয়ে পড়েছে।

বনহুর দোতলার পাইপ বেয়ে উঠে গেল। সম্মুখের কক্ষটার মধ্যে নীল আলো জ্বলছে। জানালার শার্সী খুলে উকি দিল। এটা বিনয় সেনের কক্ষ বুঝতে পারল সে। কারণ বিছানায় একজন মাত্র বয়স্ক লোক ঘুমিয়ে রয়েছেন।

বনহুর এগুলো সামনের দিকে।

পাশাপাশি দু'খানা কক্ষ পেরিয়ে ওপাশের কক্ষটায় মৃদু আলোকরশ্মি দেখতে পেল সে।

বনহুর কাঁচের শার্সীর ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। ডিমলাইটের ক্ষীণালোকে দেখতে পেল একটা খাটের উপর দুগ্ধফেননিভ শুভ্র বিছানায় পাশাপাশি ঘুমিয়ে আছে সুভাষিণী আর মধু সেন। সুভাষিণীর দক্ষিণ হাতখানা মধুসেনের বুকের উপর।

বনহুর কালবিলম্ব না করে কৌশলে কক্ষে প্রবেশ করল। লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে খাটের পাশে। প্যান্টের পকেট থেকে নেকলেস ছড়া বের করল।

কক্ষের স্বল্পালোকে নেকলেসের মতিগুলো ঝকমক করে উঠল নেকলেস ছাড়া অতি সন্তর্পণে সুভাষিণীর শিয়রে রেখে ওপাশের জানাল দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

পেছনের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আমবাগানে প্রবেশ করতেই নারীকণ্ঠে কে যেন বলে উঠল—দাঁড়াও!

থমকে দাঁড়াল বনহুর। কালো পাগড়ীর ঝোলানো অংশটা ভাল করে গুঁজে দিল কানের একপাশে। মুখের অর্ধেকটা ঢাকা পড়ে গেল। ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠলো বনহুর। আমগাছের পাতার ফাঁকে জোস্নার কিঞ্চিৎ আলো এসে পড়েছে, পেছনের সেই নারীর মুখমণ্ডলে। বনহুর অবাক হয়ে দেখলো, অদূরে দাঁড়িয়ে সুভাষিনী। হাতে সেই নেকলেস ছড়া।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়াল।

সুভাষিণী এগিয়ে এলো বনহুরের পাশে। আমবাগানের আবছা অন্ধকারে নিপুণ দৃষ্টি মেলে তাকাল সে বনহুরের মুখের দিকে। শুধুমাত্র চোখ দুটো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। আরও সরে দাঁড়াল সুভাষিণী, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলল আজ তোমায় ধরেছি। তুমি না দস্যু, অমন করে চোরের মত পালাচ্ছিলে কেন?

বনহুর নিশ্চুপ।

সুভাষিণী হেসে বলল— কি, জবাব দিচ্ছো না যে? তোমার সব চালাকি ফাঁস হয়ে গেছে দস্যু-নিয়ে যাও, তোমার এ নেকলেস নিয়ে যাও। বনহুরের দিকে ছুড়ে মারে সুভাষিণী নেকলেস ছড়া।

সুভাষিণীর ছুড়ে মারা নেকলেস ছড়া বনহুরের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে। বনহুর চট করে ধরে ফেলে নেকলেসখানা।

সুভাষিণী দেখল আমবাগানের ঝাপসা আলোতে বনহুরের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। কিছুক্ষণ নির্বাক দৃষ্টিতে সুভাষিণীর দিকে তাকিয়ে নেকলেস ছড়া ছুঁড়ে ফেলে দিল আমবাগানস্থ পুকুরের জলে।

ঝুপ করে একটা শব্দ হল।

সুভাষিণী হতবাক, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তাকাল পুকুরের দিকে। জ্যোস্নার আলোতে সে দেখতে পেল, পুকুরের জলে যেখানে নেকলেস ছড়া ডুবে গিয়েছিল সেখানে কয়েকটা বুদবুদ ভেসে উঠেছে। ফিরে তাকাতেই বিস্মিত হল সে। তার আশেপাশে কেউ নেই। যেখানে দস্যু বনহুর দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে খানিকটা জ্যোস্নার আলো ছড়িয়ে রয়েছে মাটির বুকে।

বিষণ্ণ মনে সুভাষিণী ফিরে এলো নিজের ঘরে।

স্বামীর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল কতক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে। তারপর স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে ডাকল— ওঠো, কত ঘুমাচ্ছ?

চোখ মেলে তাকালো মধু সেন, তারপর, সুভাষিণীকে টেনে নিলো কাছে। আবেগভরা কণ্ঠে বলল— তোমার ঘুম ভেঙে গেছে সুভা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলল সুভাষিণী।

❑

খান বাহাদুর ব্যস্তসমস্ত হয়ে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করলেন। চোখে মুখে তাঁর উদ্বিগ্নতা। ললাটে গভীর চিন্তারেখা, বিষণ্ন মুখমণ্ডল।

পুলিশ অফিসে প্রবেশ করতেই মিঃ হারুন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, বললেন....ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

খান বাহাদুর সাহেব বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন—কি আর বলবো ইন্সপেক্টার, আমার একমাত্র পুত্র নিয়ে কি যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করছি!

বসুন। মিঃ হারুন নিজেও আসন গ্রহণ করলেন।

খান বাহাদুর সাহেব আসন গ্রহণ করার পর মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার পুত্র মুরাদ তো এখন জামিনে আছে?

হ্যাঁ ইন্সপেক্টর, ওকে আমি জামিনে খালাস করে নিয়েছিলাম—কি করবো বলুন, একমাত্র সন্তান....কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে তিনি বললেন—গত কাল থেকে আবার সে কোথায় উধাও হয়েছে।

মুহূর্তে মিঃ হারুনের চোখ দুটো রাঙা হয়ে ।ওঠে তিনি প্রায় চিৎকার করে ওঠেন—এ কি বলছেন খান বাহাদুর সাহেব? জানেন সে অপরাধী?

কি করবো বলুন, আমি যে পাগল হবার-জোগাড় হয়েছি।

মিঃ হারুন গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জামিনের অপরাধী যদি পলাতক হয়, সেজন্য আইনে জামিনদার অপরাধী—এ কথা আপনার হয়তো অজানা নেই?

সে কথা আমি জানি ইন্সপেক্টর। কিন্তু কি করবো বলুন। আমি যে দিশেহারা হয়ে পড়েছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন— খান বাহাদুর সাহেব–একমাত্র পুত্রকে আমি মানুষের মত মানুষ করতে চেয়েছিলাম। অনেক আশা–ভরসা ছিল ওর ওপর আমার, কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেল, উচ্চশিক্ষিত করার জন্য ওকে আমি বিলেত পাঠালাম। টাকা-পয়সা ঐশ্বর্য যা যখন চেয়েছে তাই আমি ওকে দিয়েছি। কোনো অভাব আমি ওকে বুঝতে দেইনি। তবু....

সেই কারণেই আপনার পুত্র অধঃপতনে গেছে। বেশি আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা আপনি খেয়ে ফেলেছেন খান বাহাদুর সাহেব।

হয়তো তাই। মা-মরা সন্তান বলে কোনদিন ওকে আমি আঘাত করিনি, করতে পারিনি। সেটাই হয়েছে আমার জীবনের চরম ভুল।

দেখুন খান বাহাদুর সাহেব, এখন আফসোস করে কোন ফল হবে না। আপনার পুত্রকে খুঁজে বের করুন।

আমি এ দু'দিনে বহু জায়গায় সন্ধান নিয়েছি, কিন্তু কোথাও পেলাম না। এখন আপনাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া কোন উপায় দেখছি না। ইন্সপেক্টার, আপনি দয়া করে—

আপনার অনুরোধ জানাতে হবে না খান বাহাদুর সাহেব। এক্ষুণি আপনার পুত্র মুরাদের নামে আমরা ওয়ারেন্ট বের করছি।

খান বাহাদুর সাহেব প্রস্থান করার পর মিঃ হারুন সাব ইন্সপেক্টার জাহেদ আলী সাহেবকে ডেকে সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। খান বাহাদুর সাহেবের ছেলের নামে ওয়ারেন্ট বের করার আদেশ দিলেন।

গোটা শহরে সি. আই. ডি. অফিসাররা মুরাদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন।

মিঃ আলম কিন্তু এ ব্যাপারে কিছুমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। তিনি ব্যাপারটা শোনার পর নিশ্চুপ রইলেন।

একদিন পুলিশ অফিসে মিঃ হারুন, মিঃ জাফরী এবং মিঃ আলম বসে মুরাদের অন্তর্ধান ব্যাপার নিয়ে আলোচনা চলছিল। মিঃ হোসেনও আজ অফিসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর দক্ষিণ হাতের ক্ষত শুকিয়ে গেছে। তিনি এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করেছেন।

মিঃ হোসেন বলে ওঠেন—আমার মনে হয় সেই ছায়ামূর্তি অন্য কেউ নয়—ঐ শয়তান মুরাদ...এই তিনটা হত্যাও সে-ই করেছে।

আমারও এখন সেরকমই মনে হচ্ছে। গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন—মুরাদই যে ছায়ামূর্তি এবং সে-ই যে এই তিনটি খুন সংঘটিত করেছে তার কোন প্রমাণ এখনও আমরা পাইনি।

মিঃ হারুন বললেন—স্যার, আপনি মুরাদ সম্বন্ধে তেমন বেশি কিছু জানেন না। এতবড় বদমাইশ বুঝি আর হয় না। ধনকুবের খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ যেন শয়তানের প্রতীক।

মিঃ জাফরী বললেন— আমি এই মুরাদ সম্বন্ধে পুলিশের ডায়েরী থেকে কিছু জানতে পেরেছি, আরও জানা দরকার।

হ্যাঁ স্যার, এই দুষ্ট শয়তান নাথুরামের সহায়তায় একেবারে শয়তানির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কি দস্যু বনহুরকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল

সে। চুরি, ডাকাতি, লুটতরাজ, নারী হরণ-দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ হোসেন বলেন—এবার সে হত্যাকাণ্ডও শুরু করেছে।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনি নিশ্চুপ রইলেন কেন? কিছু মন্তব্য করুন। আপনার কি মনে হয় এই হত্যারহস্যের সঙ্গে পলাতক মুরাদ জড়িত?

একথা সোজাসুজি বলা মুস্কিল স্যার। তবে মুরাদকে যতক্ষণ পাওয়া না যাচ্ছে, ততক্ষণ তার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না। মিঃ আলম কথাটা বলে থামলেন।

এমন সময় ডাক্তার জয়ন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন পুলিশ অফিসে প্রবেশ করে ব্যস্তকণ্ঠে জানালেন—স্যার, আজ আবার সেই ছায়ামূর্তি আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল এবং আবার বাবার সহকর্মী নিমাই বাবুকে....

অস্ফুট শব্দ করেন মিঃ হারুন-খুন করেছে?

না। তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বসুন। বসে সমস্ত ঘটনা খুলে বলুন—বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠল। তিনি হেমন্ত সেনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালেন।

হেমন্ত সেনের মুখমণ্ডলে ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। তিনি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—গভীর রাতে হঠাৎ একটা আর্তচিৎকারে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দ্রুত কক্ষের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার নজরে পড়ল একটা জমকালো ছায়ামূর্তি সদর দরজা দিয়ে দ্রুত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি সন্ধান নিয়ে দেখলাম কোন ঘরে কিছু হয়নি। শুধু নিমাই বাবুর কক্ষে তিনি নেই দেখতে পেলাম। অনেক খোঁজাখুজি করেও বাড়ির কোথাও তার সন্ধান পেলাম না। কক্ষে শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে।

হুঁ ব্যাপারটা দেখছি ক্রমান্বয়ে জটিল রহস্যজালে জড়িয়ে পড়েছে। গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হারুন এবং মিঃ আলম নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছিলেন, মিঃ আলম বলে ওঠেন—এই রহস্যজাল কৌশলে গুটিয়ে আনতে হবে।

মিঃ জাফরী মৃদু হেসে বললেন—সেই জালের মধ্যে যে জড়িয়ে পড়বে সেই । হচ্ছে ছায়ামূর্তি।

হেমন্ত সেন নিমাইবাবুর নিখোঁজ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ অফিসে ডায়েরী করে বিদায় হলেন।

সেদিন মিঃ জাফরী আর বেশিক্ষণ অফিসে বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি আজ অন্য কোথাও গেলেন না। ড্রাইভারকে বাংলো অভিমুখে গাড়ি চালাবার নির্দেশ দিলেন।

মিঃ জাফরীর গাড়ি যখন ডাকবাংলার গেটের মধ্যে প্রবেশ করল ঠিক সেই মুহূর্তে একটা কালো রঙের গাড়ি গেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে মিঃ জাফরীর গাড়ির পাশ কেটে চলে গেল।

মিঃ জাফরী লক্ষ্য করলেন, গাড়ির হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে বসে আছে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি।

মাত্র এক মুহূর্ত, ছায়ামূর্তিসহ গাড়িখানা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলল—ড্রাইভার, ঐ গাড়িখানা অনুসরণ কর।

ড্রাইভার গাড়িখানা বাংলোর গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় বের করে আনল এবং অতি দ্রুত গাড়ি চালাতে শুরু করল।

কিন্তু ততক্ষণে সম্মুখস্থ গাড়িখানা বহুদূর এগিয়ে গেছে।

মিঃ জাফরী দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবার জন্য আদেশ দিলেন। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটল। বড় রাস্তা ছেড়ে গলিপথে ছুটতে লাগল এবার মিঃ জাফরীর গাড়িখানা। হঠাৎ দেখা গেল পথের একপাশে সেই ছোট্ট কালো রঙের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গাড়ির চালক ঝুঁকে পড়ে কি দেখছে।

মিঃ জাফরী ড্রাইভারকে গাড়ি রাখতে বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার আদেশ পালন করল।

গাড়ি থেমে পড়তেই মিঃ জাফরী প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। হ্যাঁ, এই সেই গাড়ি, যে গাড়িতে একটু পূর্বে তিনি ছায়ামূর্তিকে দেখেছিলেন।

মিঃ জাফরীর চোখ দুটো ভাটার মত জ্বলে উঠলো। তিনি দ্রুত ছুটে এসে ঝুঁকে পড়া লোকটার পিঠে রিভলভার চেপে ধরে গর্জে উঠলেন—খবরদার!

গাড়ির চালক মুখ তুলল। একি! বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী—মিঃ শঙ্কর রাও!

মিঃ শঙ্কর রাও হেসে বলেন—হঠাৎ এভাবে আপনি, আমাকে....

আপনিই এখন আমার ডাকবাংলোর দিক থেকে আসছেন না?

আসছি নয়, যাচ্ছি স্যার। গোপনে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

মিঃ জাফরী হতবুদ্ধির মত রিভলভারখানা ধীরে ধীরে সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন—এ গাড়িখানা আপনার?

মিঃ শঙ্কর রাও বললেন—না স্যার, এ গাড়ি আমার এক আত্মীয়ের। আমার গাড়িখানা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই গাড়ি চেয়ে নিয়ে এসেছি। দেখুন তো, এটাও হঠাৎ বিগড়ে বসেছে।

হুঁ। মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। তিনি বললেন–আসুন আমার গাড়িতে। ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বলেন–তুমি দেখো ওটার কি নষ্ট হয়েছে।

মিঃ শঙ্কর রাও মিঃ জাফরীর গাড়িতে চেপে বসলেন।

মিঃ জাফরী নিজেই ড্রাইভ করে চললেন।

বাংলোয় ফিরে মিঃ জাফরী অবাক হলেন।

মিঃ জাফরীর কক্ষে বাংলোর দারোয়ানকে বন্দী অবস্থায় পাওয়া গেল। হাত-পা মজবুত করে বাঁধা। মুখে একটা রুমাল গোঁজা। হাতের বন্দুকখানা তার হাতের সঙ্গেই দড়ি দিয়ে জড়ানো। মিঃ জাফরী প্রবেশ করেই এ দৃশ্য দেখতে পেলেন।

শঙ্কর রাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে দারোয়ানের হাত-পা'র বাঁধন খুলে দিতে শুরু করলেন।

মিঃ জাফরী হুঙ্কার ছাড়লেন—বয়, বয়..

কোন সাড়া নেই। গোটা বাংলো যেন নিঝুমপুরী হয়ে রয়েছে।

ততক্ষণে শঙ্কর রাও দারোয়ানের হাত-পার বাঁধন খুলে দিয়েছেন। মুখের রুমালখানা বের করে ফেলেছেন তিনি।

দারোয়ান মুক্তি পেয়ে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে– হুজুর, এক ভয়ঙ্কর ছায়ামূর্তি!

ছায়ামূর্তি? অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ জাফরী।

দারোয়ান কাঁপতে কাঁপতে বলল— সারা শরীরে তার কালো আলখেল্লা। শুধু চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল হুজুর। একেবারে ভূতের মত কালো দু'খানা হাত।

শঙ্কর রাওয়ের মুখ বিবর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি অবাক হয়ে রইলেন –একি কাণ্ড স্যার?

মিঃ জাফরী গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন? মিঃ শঙ্কর রাওয়ের কথায় কান দিলেন না। দারোয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন—আর সব ওরা কোথায় গেলো?

ছায়ামূর্তি সবাইকে পাকের ঘরে বন্ধ করে রেখেছে হুজুর।

এসব তুমি চেয়ে চেয়ে দেখছিলে শুধু?

না হুজুর। আমাকেও ঐ পাকের ঘরে আটকে ফেলেছিল, পরে কি মনে করে আবার টেনে এই ঘরে এনে রেখে গেল।

দেখুন স্যার, ঘরের জিনিসপত্র তো ঠিক আছে? কথাটা বললেন শঙ্কর রাও।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই বলে উঠল দারোয়ান– হুজুর, ছায়ামূর্তি ঘরের কোন জিনিসেই হাত দেয়নি, শুধু ঐ যে টেবিলে কাগজখানা দেখছেন ওটা সে রেখে গেছে।

বল কি, ছায়ামূর্তি চিঠি রেখে গেছে! মিঃ জাফরী এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে কাগজখানা তুলে নিলেন হাতে। লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মেলে ধরে পড়লেন– 'হত্যাকারীকে হত্যা করেছি। তুমি ফিরে যাও জাফরী।'

শঙ্কর রাও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন– আশ্চর্য স্যার।

শুধু আশ্চর্য নয় মিঃ রাও, অত্যন্ত বিস্ময়কর। ছায়ামূর্তির এই দুই ছত্র লেখার মধ্যে গভীর রহস্য লুকানো রয়েছে। ছায়ামূর্তি আমাকে ফিরে যাবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে ... হঠাৎ মিঃ জাফরী অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন– হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির চেয়ে জাফরী কোন অংশে বুদ্ধিহীন নয়। চলুন মিঃ শঙ্কর রাও, আপনার কথাটা এবার শোনা যাক।

চলুন স্যার।

মিঃ জাফরী বাংলোর বসবার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

❑

অতো কেঁদে আর কি হবে বিবি সাহেবা! এটা দুনিয়ার খেলা, জীবন মৃত্যু এ যে মানুষের সাথী! জন্মালে একদিন মরতে হবেই? সরকার সাহেব মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মরিয়ম বেগম অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলেন— সরকার সাহেব, আমি যে সাগরের পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। এই দুর্দিনে ভাগ্যিস আপনি ছিলেন, তাই একটু সান্ত্বনা।

বিবি সাহেবা, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই।

কিন্তু চিন্তা না করে কোন উপায় নেই সরকার সাহেব। চিন্তা না করলেও কোথা থেকে একরাশ চিন্তা এসে মাথার মধ্যে সব এলোমেলো করে দেয়। জানি জন্ম-মৃত্যুকে মানুষ কোন দিন পরিহার করতে পারবে না চৌধুরী সাহেবের যদি স্বাভাবিক মৃত্যু হত তাহলে আমি এত শোকাভিভূতা হতাম না। কিন্তু তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়– কে তাঁকে হত্যা করল, কেন তাঁকে হত্যা করা হল, কি তাঁর অপরাধ ছিল?– এসব প্রশ্ন আমাকে পাগল করে তুলেছে সরকার সাহেব। একটু থেমে পুনরায় বললেন মরিয়ম বেগম— মা মনিরার অবস্থাও তো স্বচক্ষে দেখছেন। ওর মামুজানের মৃত্যুর

পর মেয়েটা কেমন হয়ে গেছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, সব সময় উদ্‌ভ্রান্তের মত বিছানায় পড়ে থেকে শুধু চোখের পানি ফেলে। মা আমার দিন দিন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ওর চোখের পানি আমার আরও অস্থির করে তুলেছে। কি করে আমি চিন্তামুক্ত হই বলুন?

বিবি সাহেবা, পুলিশমহল চৌধুরী সাহেবের হত্যাকাণ্ডের গোপন রহস্য উদঘাটনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। মিঃ জাফরী সদা-সর্বদা এই হত্যাকাণ্ড ব্যাপারে ছুটাছুটি করছেন। নিশ্চয়ই এ রহস্য ভেদ হবেই এবং হত্যাকারীর কঠিন সাজাও হবে।

কিন্তু আমি আর কি তাঁকে ফিরে পাবো সরকার সাহেব!

কেউ তা পায় না বিবি সাহেবা। মৃত্যুর গভীর ঘুম থেকে কেউ আর জেগে ওঠে না।

তবে?

শুধু সান্ত্বনা হবে দোষীর উচিত সাজা হয়েছে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে নকিব—আম্মা, ইন্সপেক্টার সাহেব এসেছেন, আপনার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে চান। সঙ্গে এক সাহেব লোক আছেন।

দেখুন তো সরকার সাহেব?

সরকার সাহেব বেরিয়ে যান, একটু পরে ফিরে এসে বলেন—বিবি সাহেবা, ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন এসেছেন—একজন ভদ্রলোকও আছেন তাঁর সঙ্গে।

মরিয়ম বেগম বললেন– উনাদেরকে ভিতর বাড়ির বৈঠকখানায় এনে বসান সরকার সাহেব, আমি আসছি।

সরকার সাহেব পুনরায় বেরিয়ে যান। তিনি মিঃ হারুন এবং তাঁর সঙ্গীকে হলঘরে বসিয়ে অন্দরবাড়িতে খবর দিতে গিয়েছিলেন, এবার তিনি ভদ্রমহোদয়কে ভিতরবাড়ির বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন।

একটু পর মরিয়ম বেগম বৈঠকখানায় প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে সালাম জানালেন মিঃ হারুন এবং তাঁর সঙ্গের ভদ্রলোক। ভদ্রলোক অন্য কেউ নয়, মিঃ আলম।

মিঃ হারুন প্রথমে মিঃ আলমের সঙ্গে মরিয়ম বেগমের পরিচয় করিয়ে দিলেন। উনি ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু মিঃ আলম। ইনি একজন গোয়েন্দা। তবে মাইনে করা নয়—সখের গোয়েন্দা। মিসেস চৌধুরী, ইনি চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য উদঘাটনে আমাদের সহায়তা করে চলেছেন।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—আমি উনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।

মিসেস চৌধুরী, উনি আপনার নিকটে যা জানতে চাইবেন, বিনা দ্বিধায় বলে যাবেন। কিছু যেন লুকাবেন না। এমনকি আপনার পুত্র সম্বন্ধেও কিছু গোপন করবেন না।

মরিয়ম বেগম মাথা দুলিয়ে বললেন– আচ্ছা।

মামীমার সঙ্গে যখন মিঃ হারুন এবং মিঃ আলমের কথাবার্তা হচ্ছিল তখন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা সব লক্ষ্য করছিল ও শুনে যাচ্ছিল।

মিঃ আলম চৌধুরী সাহেবের জীবনী সম্বন্ধে মরিয়ম বেগমকে তখন প্রশ্ন করছিলেন– মিসেস চৌধুরী, আপনার স্বামীর কি কোন শত্রু ছিল বলে আপনার ধারণা হয়?

না, আমার স্বামীর কোন শত্রু ছিল না। তিনি অতি মহৎ লোক ছিলেন। ইন্সপেক্টার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেই তাঁর সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

মহৎ ব্যক্তিরও শত্রু থাকে মিসেস চৌধুরী। বললেন মিঃ হারুন।

মিঃ আলম বলে ওঠেন– আমি চৌধুরী সাহেবের মহত্ব, উদারতা এবং চরিত্র সম্পর্কে পুলিশ অফিস থেকে জানতে পেরেছি। তবু আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

করুন।

দেখুন আপনি আমার কাছে কিছুই গোপন করবেন না।

না, কিছু গোপন করব না। জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। তাকে আপনারা ক'বছর আগে হারিয়েছিলেন?

ঠিক আমার স্মরণ নেই, তবে বছর চৌদ্দ-পনেরো এমনি হবে।

সে হারিয়ে যাবার পর আপনি একটা মেয়েকে কন্যা বলে গ্রহণ করেছেন।

হ্যাঁ, সে আমার ননদের মেয়ে, নিজের মেয়ের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

চৌধুরী সাহেবের অবর্তমানে সেই কি আপনাদের এই বিষয়-আশয়ের একমাত্র অধিকারিণী?

হ্যাঁ, সে ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই।

কেন, আপনার পুত্র মনিরকে আপনি অস্বীকার করেন?

করি না। কিন্তু সে তো আর নেই।

চৌধুরী সাহেবের হত্যা ব্যাপারে আপনার ভাগ্নীর কোন ষড়যন্ত্র থাকতে পারে তো–

চুপ করুন! পৃথিবী পাল্টে গেলেও ওসব আমি বিশ্বাস করব না, করতে পারি না। ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর মরিয়ম বেগমের।

মনিরা দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত পিষতে লাগল, এত বড় একটা মিথ্যা সন্দেহ কেউ করতে পারে এ যেন তার ধারণার বাইরে। রাগে-ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগল সে।

মরিয়ম বেগম বলে চলেছেন, মনিরা ওর মামার মৃত্যুর পর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছে। ফুলের মত সুন্দর মুখখানা ওর শুকিয়ে গেছে। কি যে বলেন আপনারা, ও কথা আমি কখ্খনো বিশ্বাস করব না। তাছাড়া মনিরা আমার ঘরের মেয়ে।

মিসেস চৌধুরী, আমি আপনার ভাগ্নী মিস মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

মিঃ হারুন বললেন– মিঃ আলম, আপনি মিস মনিরার সঙ্গে পরিচিত হলেই বুঝতে পারবেন, সে তেমন ধরনের মেয়েই নয়।

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– সরকার সাহেব, মনিরাকে ডাকুন।

মরিয়ম বেগমের কথা শেষ হতে না হতেই কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা, চোখ মুখের ভাব উগ্র; তীব্রকণ্ঠে বলল– আমাকে ডাকছ?

হ্যাঁ মা, ইনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

মিঃ আলমের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললেন– বসুন মিস মনিরা।

বলুন কি বলবেন? মনিরা না বসেই রাগত কণ্ঠে কথাটা বলে।

আবার একটু হাসলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুন বললেন– মিস মনিরা, উনি যা জিজ্ঞাসা করেন তার উত্তর দিন।

নিশ্চয়ই দেব।

মিঃ আলম বললেন—আপনি অযথা ক্ষুণ্ন হচ্ছেন মিস মনিরা। জানেন আপনার মামার হত্যা ব্যাপারে আমরা আপনাকে সন্দেহ করছি?

মিথ্যা আপনাদের সন্দেহ। মামুজানের হত্যা ব্যাপারে আপনাদেরই যে চক্রান্ত নেই তাই বা কে জানে! আমি শুনেছি, আমার মামুজান সেদিন যে পার্টিতে যোগ দিয়ে জীবন হারিয়েছেন, ঐ পার্টিতে আপনারাও উপস্থিত ছিলেন।

অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলেন মিঃ আলম।

মিঃ হারুনও মিঃ আলমের হাসিতে যোগ দিলেন, তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—দেখলেন মিঃ আলম, মিস মনিরা এখন আমাদেরকেই তার মামুজানের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করে নিয়েছেন।

এবার গম্ভীর হয়ে পড়লেন মিঃ আলম— মিস মনিরার সন্দেহ অহেতুক নয় মিঃ হারুন। চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী কে এখনও তা কেউ জানে না। কাজেই আপনি, আমি, মিস মনিরা কিংবা তার দস্যুপুত্র বনহুরও হতে পারে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন মরিয়ম বেগম—না না, আমার মনির কখনও এ কাজ করতে পারে না।

তবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় মিসেস চৌধুরী? প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

মরিয়ম বেগম জবাব দিলেন- কেমন করে বলব! আমার স্বামী যে ফেরেস্তার মত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর যে কোন শত্রু ছিলো না, তা-ই আমি জানি।

মিঃ আলম এবার মনিরাকে লক্ষ্য করে বলেন- মিস মনিরা, আপনিও জানেন আপনার মামুর কোন শত্রু ছিল না বা নেই। তবে কে তাঁকে হত্যা করল, আর কেনই বা করল?

আমিও সেই প্রশ্ন আপনাকে করছি। কারণ আমার মামুর হত্যাকালে আমি সেখানে ছিলাম না, বরং আপনারা সেখানে ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুকালেও উপস্থিত ছিলেন।

তাহলে উনার পুত্র বনহুরের চক্রান্তে?

না, তাও নয়। সে দস্যু হতে পারে, সে ডাকু হতে পারে, কিন্তু পিতৃহত্যাকারী নয়। তীব্র কণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে মনিরা।

মিস মনিরা, আপনি ভুল করছেন। দস্যু-ডাকুদের আবার ধর্ম, জ্ঞান আছে নাকি! আমার মনে হয় দস্যু বনহুরই তার পিতাকে হত্যা করেছে। পূর্বের ন্যায় স্থির কণ্ঠে বললেন— মিঃ আলম।

অসম্ভব! মনিরা যেন চিৎকার করে ওঠে। একটু থেমে পুনরায় বলে— পিতাকে হত্যা করতে যাবে সে কোন্ লাভে?

পিতাকে হত্যা করলে তার দুটি উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে মিস মনিরা, এটাও কম নয়। একটা হচ্ছে প্রচুর ঐশ্বর্য, অন্যটা হয়তো আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

ঐশ্বর্যের লালসা দস্যু বনহুরের নেই, এটা আমি জানি। দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠে মনিরা।

মিঃ আলম মনিরার কথায় অট্টহাসি হেসে ওঠেন—হাঃ হাঃ হাঃ। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন—তাহলে সে দস্যুবৃত্তি করে কেন?

দস্যুতা তার নেশা—পেশা নয়।

মিস মনিরা, আপনি তাকে ভালবাসেন এ কথা আমরা জানি।

সবাই জানে। আপনিও জানবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু একজন দস্যুকে ভালবাসা অপরাধ, এটাও আপনি হয়ত জানেন?

ভালবাসা অপরাধ নয়। আমি আর আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে চাই না। আপনারা এখন যেতে পারেন। মনিরা যেমন দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করছিলো তেমনি দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মিঃ আলম উঠে দাঁড়ান —চলুন মিঃ হারুন, আমার যা প্রশ্ন করার ছিল করা হয়েছে।

মরিয়ম বেগমও উঠে দাঁড়ান—দেখুন, ওর কথায় আপনারা যেন কিছু মনে করবেন না।

না, না, আমরা এতে কিছু মনে করিনি। এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কথাটা বলে মিঃ আলম দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ হারুন তাঁকে অনুসরণ করলেন।

মরিয়ম বেগম চিন্তিত কণ্ঠে বললেন—সরকার সাহেব, মনিরার ব্যবহারে ওরা রাগ করেননি তো?

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বিবি সাহেবা। মা মনি কোন অন্যায় বলেননি। যেমন কুকুর তেমনি মুগুর।

কি জানি কখন কি ঘটে বসে—ভয় হয়।

❑

দেখ মা, তখন পুলিশের লোককে অমন করে বলা ঠিক হয়নি। শান্তকণ্ঠে মুনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন মরিয়ম বেগম।

মনিরা বিছানায় শুয়ে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। মুখ মণ্ডল বিষণ্ন। চোখ দু'টি লাল। একটু পূর্বে হয়ত কেঁদেছে সে। মামীমার কথায় বইখানা পাশে রেখে বিছানায় উঠে বসল, কোন কথা বলল না।

মরিয়ম বেগম স্নেহভরা গলায় পুনরায় বললেন—আমাদের দেখার এক খোদা ছাড়া কেউ নেই। এ অবস্থায় পুলিশের লোকরা যদি ক্ষেপে যায় তাহলে আর যে কোন উপায় থাকবে না মা।

মামীমা, এই না বললে খোদা ছাড়া কেউ নেই। তবে কেন মিছেমিছি ভয় পাচ্ছো? সত্যি কথা বলব তাতে ভয় কি? পুলিশের লোক হলো বলেই তাদের আমি তোষামোদ করে চলতে পারব না। মামীমা, যে পুলিশের লোক অযথা একজনের নামে মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে, তাদের আমি সমীহ করে চলব, এমন মনোবৃত্তিও আমার হবে না। অদৃষ্টে যা আছে হবেই মামীমা, কেন তুমি এত করে ভাবছ? দুনিয়ায় যাদের কেউ নেই তাদের কি দিন যায় না?

আজ যদি আমার মনির থাকত--- বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

কে বলে তোমার মনির নেই? দরজার ওপাশ থেকে ভেসে আসে একটা গম্ভীর শান্ত কণ্ঠস্বর।

চমকে ফিরে তাকায় মনিরা, ফিরে তাকান মরিয়ম বেগম। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উভয়ের মুখমণ্ডল। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর।

মনিরা ত্বরিত বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। এত ব্যথা বেদনার মধ্যেও তার মুখমণ্ডল এক স্বর্গীয় আভায় দীপ্ত হয়ে উঠল। ঠোঁট দু'খানা একটু নড়ে উঠে থেমে গেল।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন– মনির, বাবা তুই এসেছিস? ওরে মনির--- দুই হাত প্রসারিত করে দেন মরিয়ম বেগম পুত্রের দিকে– ওরে আয়!

বনহুরের মুখমণ্ডলে খেলে যায় এক অভূতপূর্ব আনন্দের দ্যুতি। ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে– মা!

ওরে আমার পাগল ছেলে! ওরে আমার মনির, কোথায় লুকিয়ে থাকিস্ বাবা তুই?

এই তো মা আমি তোমাদের পাশে।

আর আমি তোকে যেতে দেব না। কিছুতেই তোকে ছেড়ে দেব না মনির।

মাতা পুত্রের এই অপূর্ব মিলন মনিরার হৃদয়ে এক আনন্দের উৎস বয়ে আনে। নিষ্পলক নয়নে সে তাকিয়ে তাকিয়ে উপভোগ করে এই পবিত্র মধুময় দৃশ্য।

মরিয়ম বেগম বনহুরকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে বললেন—আমাদের দেখার কেউ যে নেই বাবা।

কেন, আমি রয়েছি তো। যখন তুমি আমায় ডাকবে, দেখবে আমি তোমাদের পাশে রয়েছি।

বাবা মনির!

হ্যাঁ মা, আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি?

জানিস্ বাবা, আজ পুলিশ এসেছিল। কি রকম সব কথাবার্তা তাদের। আমার বড্ড ভয় করে।

কোন ভয় নেই মা। যতক্ষণ তোমার মনির বেঁচে আছে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভয় নেই। যত ঝড়-ঝঞ্ঝা আসুক সব আমি বুক পেতে নেব। একটু থেমে বলে বনহুর-বাবার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী মা।

মনির!

হ্যাঁ মা, আমি খেয়াল না দেবার জন্যই তিনি আজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তাঁর হত্যাকারীকে চরম শাস্তি ... কি বলতে গিয়ে থেমে যায় বনহুর।

মরিয়ম বেগম এবং মনিরা বনহুরের মুখোভাব লক্ষ্য করে শিউরে ওঠে। চোখ দুটো ওর আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠে। দাঁতে দাঁত পিষে সে। দ্রুত নিঃশ্বাসের দরুন প্রশস্ত বক্ষ বারবার ওঠানামা করে। দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হয় তার।

মরিয়ম বেগম জীবনে পুত্রের এ রূপ দেখেননি। তিনি হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কোন কথা বলার সাহস হয় না তাঁর।

কিছুক্ষণ কেটে যায়, প্রকৃতিস্থ হয় বনহুর।

মরিয়ম বেগম বলেন—বাবা, আজ বিশটি বছর তোর মুখে আমি খাবার তুলে দেইনি। আজ আমি তোকে খাওয়াব।

এত রাতে কি খাওয়াবে মা?

ওরে, ছোটবেলায় তুই দুধের পায়েস খেতে বড় ভালবাসতিস। আজ পনের বছর ধরে আমি দুধের পায়েস তৈরি করে তোর কথা ভাবি, প্রতিদিন আমি সাজিয়ে রাখি আমার ছোট আলমারীতে। পরদিন বিলিয়ে দেই গরীব বাচ্চাদের মুখে।

আজও বুঝি রেখেছ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। তুই বোস আমি আসছি।

মনিরা বলে ওঠে—তুমি বস মামীমা, আমি আনছি।

না মা, তুই পারবি না, আমি আনছি। বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মা বেরিয়ে যেতেই বনহুর উঠে দাঁড়াল, ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেল, সে মনিরার পাশে, শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল— মনিরা!

বল।

কথা বলছ না যে?

মাতা-পুত্রের অপূর্ব মিলনে আমি যে মুগ্ধ হয়ে গেছি। স্বর্গীয় দীপ্তিময় এক জ্যোতির অনুভূতিতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মনিরা! অস্ফুট শব্দ করে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে। গভীর আবেগে বুকে চেপে ধরে বলে—আর তোমাকে পেয়ে হয়েছে আমার জীবন পরিপূর্ণ।

ছিঃ ছেড়ে দাও! মামীমা এসে পড়বেন।

আসতে দাও। মনিরা, কতদিন তোমায় এমন করে পাশে পাইনি। মনিরা, আমার মনিরা!

ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম, বাঁ হাতে তাঁর পায়েসের বাটি, দক্ষিণ হাতে পানির গ্লাস।

বনহুর মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে আসে মায়ের পাশে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হা করে —কই দাও।

মরিয়ম বেগম পানির গ্লাস টেবিলে রেখে ছোট্ট চামচখানা দিয়ে বাটি থেকে পায়েস নিয়ে মুখে তুলে দেন।

বনহুর মায়ের চেয়ে অনেক লম্বা তাই সে মাথা নীচু করে মায়ের হাতে পায়েস খেতে থাকে। তারপর খাওয়া শেষ করে টেবিল থেকে পানির গ্লাস নিয়ে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে বলে– আঃ কতদিন পর আজ আমি খেয়ে তৃপ্তি পেলাম। এমনি করে তোমার হাতে কতদিন খাইনি!

তোকে এমনি করে না খাওয়াতে পেরে আমিও কি শান্তিতে আছিরে! অহরহ আমার মনে তুষের আগুন জ্বলছে! ওরে, তোকে আমি ছেড়ে দেব না।

মা, তুমি আমাকে গ্রহণ করলেও সভ্যসমাজ আমাকে গ্রহণ করবে না। আমি যে অপরাধী

না না, তা হয় না, আমি তোকে যেতে দেব না মনির, যেতে দেব না –মরিয়ম বেগম পুত্রের জামার আস্তিন চেপে ধরেন।

বনহুর মাকে সান্ত্বনা দেয়– তুমি তো জানো মা, তোমার পুত্রকে পাকড়াও করার জন্য পুলিশ অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তোমার পুত্রকে গ্রেফতার করতে পারলে লাখ টাকা পুরস্কার পাবে। এমন অবস্থায় তুমি আমাকে রাখতে পারবে?

ধীর ধীরে বনহুরের জামার আস্তিন ছেড়ে দেন মরিয়ম বেগম, দু'গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন তিনি– তবে কাকে নিয়ে আমি বেঁচে থাকব বাবা?

মনিরাকে দেখিয়ে বলে বনহুর— ওকে নিয়ে। ঐ তো তোমার সব। কিন্তু ওকে কি আমি চিরদিন ধরে রাখতে পারব? জানিস তো, মনিরা এখন বড় হয়ে গেছে।

মায়ের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বনহুর। তার মা কি বলতে চান? মনিরা বড় হয়ে গেছে– একথা বলার পেছনে একটা ইংগিত রয়েছে, বুঝতে বাকী থাকে না বনহুরের। কিন্তু--- না না, তা হয় না---- সে যে দস্যু, মনিরা নিষ্পাপ পবিত্র, তার সঙ্গে মনিরার জীবন জড়ানো যায় না।

বনহুর একবার মায়ের মুখের দিকে আর একবার তাকায় মনিরার মুখের দিকে। অসম্ভব, মনিরার জীবনটা সে নষ্ট করতে পারে না। একটা দস্যুকে বিয়ে করে সে কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। বনহুর নিজের চুলের মধ্যে আংগুল চালনা করতে লাগল। কেমন অস্থির একটা ভাব ফুটে উঠল তার মধ্যে। হঠাৎ বলে উঠল—মা চললাম।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠেন মরিয়ম বেগম।

ততক্ষণে বনহুর পেছনের জানালা খুলে বেরিয়ে গেছে।

মনিরা নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বের হল না তার মুখ থেকে।

❑

মিঃ জাফরীর ডাকবাংলোয় ছায়ামূর্তির আবির্ভাব নিয়ে পুলিশমহলে বেশ উদ্বিগ্নতা দেখা দিল। মিঃ জাফরী রাতেই পুলিশ অফিসে ফোন করেছিলেন। মিঃ হারুন, মিঃ হোসেন এবং আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার তখনই ডাকবাংলোয় গিয়ে হাজির হলেন। মিঃ আলমও গিয়েছিলেন মিঃ হারুনের সঙ্গে।

অনেক অনুসন্ধানের পর এবং দারোয়ান ও বয়ের জবানবন্দী নিয়েও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে এতটুকু সূত্র আবিষ্কারে সক্ষম হলেন না কেউ।

মিঃ শঙ্কর রাও যে আলোচনার জন্য বাংলো অভিমুখে আসছিলেন সে কথা সেদিনের মত স্থগিত রইল। ছায়ামূর্তি নিয়েই আলাপ চলতে লাগল।

মিঃ জাফরী কিন্তু কথার ফাঁকে বারবার শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। একটা সন্দেহের ঘন ছায়া তাঁর গোটা মনকে আচ্ছন্ন করে

ফেলেছিল। তিনি যেন ঐ কালো রঙের গাড়িখানাকেই একটু পূর্বে তার বাংলোর গেটের ভেতর থেকে অতি দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন। তবে কি শঙ্কর রাওয়ের মধ্যে কোন গোপন রহস্য লুকানো আছে? মিঃ চৌধুরীর মৃত্যুর দিনও শঙ্কর রাও তাঁর পাশে বসে খাচ্ছিলেন। চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুক্ষণে মিঃ রাওয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল লক্ষ্য করেছিলেন মিঃ জাফরী। ডাক্তার জয়ন্ত সেনের সম্বন্ধেও মিঃ রাওয়ের মনোভাব খুব স্বচ্ছ ছিল না। প্রায়ই মিঃ রাও জয়ন্ত সেন সম্বন্ধে নানারকম সন্দেহজনক কথাবার্তা বলতেন। ভগবৎ সিং বৈশি দস্যু নাথুরামের সম্বন্ধে অবশ্য মিঃ শঙ্কর রাও কোনরকম মন্তব্য করেননি, তবু তার সঙ্গেও যে তার কোন ভালো ভাব ছিল তাও নয়। মিঃ জাফরী গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন ছায়ামূর্তি কে হতে পারে এবং পর পর কেনই বা সে এই তিন তিনটে খুন করল?

অনেক সন্ধান করেও ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না কেউ। সবার বিদায় গ্রহণ করার পরও মিঃ জাফরী চিন্তমুক্ত হলেন না, রাত্রে চারটা খেয়ে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু নিদ্রাদেবী কিছুতেই তাঁর কাছে আসতে চাইলেন না।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললেন মিঃ জাফরী।

শহরের শেষ প্রান্তে নির্জন স্থানে এই বাংলোখানা। বাংলোর সম্মুখের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যায় শহরের বড় বড় দালানকোঠা আর ইমারত। ছবির মত সুন্দর একটা শহর। আর পেছন বারান্দায় ফিরে দাঁড়ালে নজরে পড়ে বিস্তৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপঝাড় আর আগাছায় ভরা টিলা।

মিঃ জাফরীর মাথায় চিন্তার জাল জট পাকাচ্ছিল। পাশের টেবিলে রাখা এ্যাসট্রেটা অর্ধদগ্ধ সিগারেটে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি ভাবছিলেন, এলেন দস্যু বনহুরকে গ্রেফতারের জন্য। দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করে তিনি পুলিশমহলে স্বনামধন্য হবেন, কিন্তু তিনি জড়িয়ে পড়লেন ছায়ামূর্তির বেড়াজালে।

মিঃ জাফরীর সিগারেটের ধুয়া কক্ষটার মধ্যে একটা ধুম্রকুণ্ডলির সৃষ্টি করছিল। সামনের দরজা বন্ধ থাকলেও পেছনের জানালা মুক্ত করে দিয়েছিলেন মিঃ জাফরী। কারণ বন্ধ হওয়ায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তাঁর।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছেন, এমন সময় ঠিক তাঁর শিয়রে খট্ করে একটা শব্দ হল। কক্ষে টিমলাইট জ্বলছিল, স্বল্পালোকে ফিরে তাকালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে সঙ্গে শিয়রে রাখা রিভলভারে হাত দিতে

গেলেন, কিন্তু তার পূর্বেই চাপা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তাঁর কানে— রিভলবারে হাত দেবার চেষ্টা করবেন না।

ধীরে ধীরে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মিঃ জাফরী। ডিমলাইটের স্বল্পালোকে দেখলেন একটা জমকালো ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁর শিয়রের কাছে। হাতে তার উদ্যত রিভলভার। আবছা অন্ধকারে ছায়ামূর্তির হাতের রিভলভারখানা চক্‌চক্ করে উঠল। ছায়ামূর্তির সমস্ত শরীর জমকালো আলখেল্লায় ঢাকা।

মিঃ জাফরী ভয় পাবার লোক নন, তিনি গর্জে উঠলেন— কে তুমি?

পূর্বের ন্যায় চাপা কণ্ঠস্বর— আমার নাম ছায়ামূর্তি।

কি তোমার উদ্দেশ্য? জানো আমি তোমায় গ্রেফতারের জন্য অহরহ প্রচেষ্টা চালাচ্ছি?

জানি। কিন্তু ছায়ামূর্তিকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করেছ ঠিক তত নয়। এখনও বলছি, ফিরে যাও জাফরী।

না, আমি এই খুনের রহস্য ভেদ না করে ফিরে যাব না। কে তুমি— আমাকে জানতে হবে।

হাঃ হাঃ হাঃ, ছায়ামূর্তির আসল রূপ তুমি দেখবে? কিন্তু তুমি আমার আসল চেহারা দেখলে শিউরে উঠবে। ওপরের খোলসের চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর আমার ভেতরের চেহারা।

যত ভয়ঙ্করই হউক না কেন, ভয় পাই না আমি। জাফরী কোনদিন ভয়ঙ্কর দেখে ভয় পায় না। কথার ফাঁকে মিঃ জাফরী পুনরায় তাঁর রিভলভারে হাত দিতে যান।

কিন্তু তার পূর্বেই ছায়ামূর্তি মিঃ জাফরীর রিভলভারখানা হাতে তুলে নিয়েছে। এবার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ছায়ামূর্তি গর্জে ওঠে— আলেয়ার পেছনে ছুটাছুটি না করে সত্যের সন্ধান কর। তাহলেই সব জানতে পারবে।

মিঃ জাফরী কিছু বলার পূর্বেই ছায়ামূর্তি খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লো বাইরে।

মিঃ জাফরী চিৎকার করে ডাকলেন— দারোয়ান, দারোয়ান--- সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে -হ্যালো! হ্যালো পুলিশ অফিস? আমি মিঃ জাফরী, ডাকবাংলো থেকে বলছি। আপনি মিঃ হারেস? --- এই মাত্র আমার কক্ষে ছায়ামূর্তি এসেছিল--- মিঃ হারুন অফিসে নেই?---

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ হারেসের ভীত কণ্ঠস্বর— আমি ইন্সপেক্টার সাহেবকে ফোন করছি। তাঁকে সঙ্গে করে কি ডাকবাংলোয় আসব?

আসতে আর হবে না। ছায়ামূর্তি ভেগেছে।

কি করবো তাহলে স্যার?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি তাঁকে ফোন করে দিন। এক্ষুণি এখানে আসতে বলুন তাঁকে, আপনিও কয়েকজন পুলিশ নিয়ে চলে আসুন।

মিঃ হারুন সংবাদটা শোনামাত্র উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন– মিঃ জাফরীর কক্ষে ছায়ামূর্তি!

তৎক্ষণাৎ পুলিশ ফোর্সসহ মিঃ জাফরীর বাংলোয় ছুটলেন মিঃ হারুন।

বাংলোর চারপাশে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালিয়েও ছায়ামূর্তির কোন খোঁজ বা চিহ্ন পাওয়া গেল না।

গোটা রাত অনিদ্রায় কাটালেন মিঃ জাফরী। সঙ্গে মিঃ হারুন ও তাঁর দলবলসহ জেগে রইলেন।

মিঃ জাফরী একসময় মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন– দেখুন মিঃ হারুন, এই ছায়ামূর্তি রহস্যটা ক্রমেই চক্রজাল বিস্তার করছে। আপনি গোপনে সমস্ত শহরের আনাচে কানাচে সি. আই. ডি. পুলিশ নিযুক্ত করে দিন।

স্যার, আপনার কথামত সি. আই. ডি. পুলিশ শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তারা আজও এই ছায়ামূর্তি সম্বন্ধে কোন রকম রিপোর্ট পেশ করতে সক্ষম হননি।

আশ্চর্য সাহস এই ছায়ামূর্তির—আপনার কক্ষে যে নিঃসঙ্কোচে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া বাংলোর চারপাশে কড়া পাহারা থাকা সত্ত্বেও সে কেমন করেই বা প্রবেশ করল! কথাগুলো বললেন মিঃ জাহেদ।

প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ পুলিশ অফিস থেকে বড় দারোগা মিঃ জসীম ফোন করলেন।

টেবিলের ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠতেই মিঃ হারুন হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন, রিসিভার তুলে নিলেন হাতে – হ্যালো, স্পিকিং মিঃ হারুন। কি বলেন, ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে ...

কক্ষে সকলেই বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন মিঃ হারুনের দিকে। মিঃ জাফরী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন– পুলিশ অফিসে ছায়ামূর্তি..... ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে গিয়েছিল। এই নিন স্যার- রিসিভারখানা মিঃ জাফরীর হাতে দেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী ফোনে মুখ রেখে গুরুত্ব গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন—কি বলছেন আপনি! ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসে প্রবেশ করেছিল?

ওপাশ থেকে ভেসে আসে মিঃ জসীমের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর–হাঁ স্যার। আমি ও আর দু'জন পুলিশ ছিলাম, কিন্তু ছায়ামূর্তির দু'হাতে দুটো রিভলভার ছিল।

সে কি করেছে? পুলিশ অফিসে তার কি প্রয়োজন ছিল?

সে ডায়েরীখানা নিয়ে কি যেন সব দেখল। দু'খানা ছবিও সে নিয়ে গেছে।

ছবি! কিসের ছবি? কার ছবি? মিঃ জাফরী গর্জে ওঠেন।

মিঃ জসীমের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর– স্যার, দাগীর ছবি। দুটো দাগী বদমাইশের ছবি নিয়ে গেছে ছায়ামূর্তি।

বলেন কি!

হ্যাঁ স্যার, অদ্ভুত কাণ্ড।

মিঃ জাফরী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলেন—এখন ভোর সাড়ে চারটা। আমরা এক্ষুণি পুলিশ অফিসে আসছি।

আসুন স্যার। অফিসে আমরা সবাই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

মিঃ জাফরী রিসিভার রেখে উঠে পড়েন। মিঃ হারুনকে লক্ষ্য করে বলেন—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যেতে হবে।

অন্য সবাই মিঃ জাফরীর সঙ্গে উঠে পড়লেন।

❑

পুলিশ অফিসে পৌঁছে মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য অফিসার বিস্মিত ও হতবাক হলেন। ছায়ামূর্তি পুলিশ অফিসের সমস্ত খাতাপত্র তচনচ করে ডায়েরীর পাতা খুঁজে বের করেছে এবং দুটো ছবি নিয়ে গেছে।

ছায়ামূর্তির এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হলেন। অফিসের ডায়েরী খাতায় সে কিসের সন্ধান করেছে? দাগীদের দু'খানা ফটোই বা সে কি করবে, ভেবে কেউ সঠিক জবাব খুঁজে পেলেন না।

ছায়ামূর্তিকে নিয়ে গভীর আলোচনা শুরু হল। সন্ধান নিয়ে দেখা গেল, যে দু'খানা ফটো অফিস থেকে হারিয়েছে তার একটা দস্যু নাথুরামের এবং অন্যটা শয়তান মুরাদের।

ব্যাপার ক্রমেই জটিল হচ্ছে।

মিঃ জাফরী গভীর চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়লেন।

ইতোমধ্যে মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ আলম এসে পুলিশ অফিসে হাজির হয়েছেন। মিঃ আলমের চোখে মুখেও উৎকণ্ঠার ছাপ। পুলিশ অফিসে হানা দেয়া। এ কম কথা নয়! ছায়ামূর্তির দুঃসাহস ক্রমে বেড়েই চলেছে।

মিঃ জাফরী বহুক্ষণ নিশ্চুপ চিন্তা করার পর বললেন– ছায়ামূর্তি যেই হউক সে শিক্ষিত।

আপনার অনুমান সত্য স্যার। ছায়ামূর্তির আচার ব্যবহারে তাকে অত্যন্ত চতুর এবং বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। মিঃ আলম বললেন।

মিঃ জাফরী ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন– শুধু চতুর আর বুদ্ধিমানই সে নয় মিঃ আলম– অত্যন্ত ধূর্ত।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– এই ছায়ামূর্তি মুরাদ ছাড়া অন্য কেউ নয়। সে একদিকে যেমন শিক্ষিত তেমনি বুদ্ধিমান। বিলাতে কত বছর কাটিয়ে এসেছে। শিয়ালের মত ধূর্ত সে।

হ্যাঁ স্যার, সেই যদি না হবে তবে নাথুরাম এবং মুরাদের ফটো সে নিয়ে যাবে কেন! মিঃ জাহেদ বললেন।

ছায়ামূর্তি নিয়ে যখন গভীর আলোচনা চলছিল ঠিক সেই সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন মুরাদের পিতা খান বাহাদুর সাহেব। কক্ষস্থ সবাই হঠাৎ এই ভোরবেলায় খান বাহাদুর সাহেবকে হন্তদন্ত হয়ে অফিসে প্রবেশ করতে দেখে আশ্চর্য হলেন।

আজ তাঁকে ছন্নছাড়ার মত লাগছিল। তেলবিহীন উস্কখুস্ক সাদা চুলগুলো এলোমেলো, ঘোলাটে চোখে বেদনার সুস্পষ্ট ছাপ, মুখমণ্ডল বিষণ্ন –উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত ভাব।

কক্ষস্থ সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন।

মিঃ হারুন জিজ্ঞাসা করলেন– ব্যাপার কি খান বাহাদুর সাহেব?

হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন খান বাহাদুর সাহেব—একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

দুর্ঘটনা! আপনার না আপনার পুত্রের? জিজ্ঞাসা করলেন মিঃ হারুন।

আমার! আমার ইন্সপেক্টর, আমার। পুত্রের আমি কোন ধার ধারি না। সে মরলেও আমার ক্ষতি নেই, বাঁচলেও আমার লাভ নেই।

তবে আপনার কি দুর্ঘটনা ঘটল?

কি বলব ইন্সপেক্টার সাহেব, কি বলব-- ধপ্ করে পাশের একটা চেয়ারে বসে পড়েন খান বাহাদুর সাহেব, তারপর ঘোলাটে চোখে একবার কক্ষের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন– যে ছায়ামূর্তি নিয়ে আপনারা উতলা হয়ে পড়েছেন, সেই ছায়ামূর্তি আজ আমার ওপর হামলা চালিয়েছিল।

কক্ষে যেন বাজ পড়ে।

মিঃ জাফরী বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন ছায়ামূর্তি।

হ্যাঁ জনাব। আজ ক'দিন আমার মনের অবস্থা ভালো নেই, একমাত্র সন্তানের জ্বালায় আমি তো পাগল হয়ে গেছি।

এখনও হননি। আরও হবেন। গম্ভীর স্থিরকণ্ঠে বলেন মিঃ আলম।

সত্যি, আমার ওকে নিয়ে কি যে যন্ত্রণা! ওর চিন্তায় ঘুম নেই চোখে। সারাটা রাত অনিদ্রায় কাটে। আজও তেমনি গোটা রাত দুশ্চিন্তায় ছটফট করেছি। ভোর পাঁচটা কিংবা সাড়ে পাঁচটা হবে, আমি শয্যা ত্যাগ করে বাইরে বেরুতে যাব, এমন সময় হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা জমকালো ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

কক্ষস্থ সবাই থ' মেরে শুনছেন।

খান বাহাদুর সাহেবের চোখেমুখে ভীতি ভাব ফুটে উঠেছে। তিনি বলে চলেছেন– আমি ছায়ামূর্তি দেখে চিৎকার করতে যাব অমনি তার হাতের রিভলভারে নজর পড়তেই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার। ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম– তুমি কে? অদ্ভুত মূর্তিটা জবাব দিল, আমি ছায়ামূর্তি। হঠাৎ খান বাহাদুর সাহেব কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে উঠলেন– ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তি আমার সর্বস্ব নিয়ে গেছে।

আচ্ছা, ঘটনাটা আগে বিস্তারিত বলুন! বললেন মিঃ জাফরী।

সে আমার কাছে এক লাখ টাকা চেয়ে বসল। না হলে আমাকে সে হত্যা করবে বলে ভয় দেখাল।

তারপর?

আমি কি করি বলুন? জীবনের ভয় কার না আছে? বারবার দরজার দিকে তাকাতে লাগলাম, ভাবলাম—বয়টা এতক্ষণও আসে না কেন? কারণ, আমার একটা বয় আছে, সে খুব সকালে উঠে আমাকে মুখহাত ধোয়ার পানি দিত এবং চা তৈরি করে দিত। আশ্চর্য ইন্সপেক্টার সাহেব, ছায়ামূর্তিটা যেন আমার মনের কথা বুঝতে পারল। সে চাপাকণ্ঠে বলল— ওরা এখন কেউ আসবে না খান বাহাদুর সাহেব।

শেষ পর্যন্ত কি করলেন আপনি? এবার প্রশ্ন করলেন মিঃ হারুন।

কি করবো, লাখ টাকা দিয়ে ছায়ামূর্তিকে বিদায় করলাম। কিন্তু আমি কি করব ইন্সপেক্টার, আমার সর্বস্ব সে নিয়ে গেছে.....

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– ঘাবড়াবেন না খান বাহাদুর সাহেব, এটাও আপনার গুণধর পুত্র মুরাদের কারসাজি।

মিঃ হারুনের দিকে তাকান খান বাহাদুর সাহেব– তার মানে?

মানে ছায়ামূর্তির বেশে আপনার পুত্রই আপনার লাখ টাকা হস্তগত করেছে।

না না, সে গলা মুরাদের নয়।

আপনি বুঝতে পারছেন না খান বাহাদুর সাহেব, একটা যন্ত্র আছে সেটা মুখে পরলে তার কণ্ঠস্বর কেউ চিনতে পারবে না বা পারে না।

আপনারা বলতে চান সেই ছায়ামূর্তি আমার ছেলে মুরাদ?

অসম্ভব নয় খান বাহাদুর সাহেব। আপনার পুত্রের নিরুদ্দেশের পেছনে বিরাট একটা রহস্য আছে। সেই রহস্যকে কেন্দ্র করেই এই তিনটে খুন সংঘটিত হয়েছে। কথাগুলো বলে থামলেন মিঃ হারুন।

মিঃ জাফরী এতক্ষণ গম্ভীরভাবে সব শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি সোফায় ভাল হয়ে বসে বললেন–মিঃ হারুন, ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পুত্র মুরাদই এটা আপনি সঠিক করে বলতে পারেন না। কারণ ছায়ামূর্তির পেছনে একটা চক্রজাল বিস্তার করে রয়েছে। কে ছায়ামূর্তি – কেউ জানে না।

খান বাহাদুর সাহেব মিঃ জাফরীর কথায় সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল। হাজার দোষে দোষী হউক তবু সে পুত্র। পিতামাতার নিকটে পুত্র-কন্যা যতই অপরাধী হউক না কেন, তবু তারা ক্ষমার পাত্র। খান বাহাদুর সাহেব কতকটা যেন আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হল। কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলে গেলেন লাখ টাকার কথা।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাঁর টাকার কথা মনে হলো তখনই তিনি হা হুতাশ করে উঠলেন– আমার লাখ টাকার কি হবে ইন্সপেক্টার সাহেব? আর কি ও টাকা পাব না?

দুরাশা খান বাহাদুর সাহেব, যে টাকা হারিয়ে যায় তা ফেরত পাওয়া দুরাশা মাত্র— মিঃ আলম শান্তকণ্ঠে বললেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন– সে কথা সত্য। হারিয়ে যাওয়া কিংবা চুরি যাওয়া জিনিস কদাচিৎ ফেরত পাওয়া যায়।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ওঠেন– খান বাহাদুর সাহেবের লাখ টাকা আর ফেরত আসবে না এটা সত্য। কারণ, ছায়ামূর্তি অতি বুদ্ধিমান। তারপর খান বাহাদুর সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন– আপনার কেসটা ডায়েরী করে যান, আমরা আপনার টাকা উদ্ধার ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখব।

খান বাহাদুর সাহেব কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

মিঃ হারুন নিজে খান বাহাদুর সাহেবের কেসটা ডায়েরী করে নিলেন।

❑

রৌদ্রদগ্ধ নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নিজের ঘরে বসে বই পড়ছিল মনিরা। মরিয়ম বেগম আজ বাড়ি নেই, কোন এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। বহুদিন তিনি বাড়ির বাইরে যাননি। বিশেষ করে চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর মরিয়ম বেগম একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নিজের ঘর ছেড়ে তিনি একরকম বেরই হন না। মনিরাই তাঁকে অনেক বলে কয়ে পাঠিয়েছে। যাও. মামীমা, খালাম্মাদের বাড়ি থেকে আজ একটু বেড়িয়ে এসো– বলেছিল মনিরা।

মরিয়ম বেগম ম্লান হেসে বলেছিলেন– ওসব আর ভাল লাগে না মা। যেখানেই যাই না কেন, শূন্য শূন্য মনে হয়। সে যে আমার সব নিয়ে গেছে।

মনিরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল–মামীমা, এভাবে নিজকে নিঃশেষে করে আর কি হবে! তিনি বেহেস্তের মানুষ, বেহেস্তে চলে গেছেন। ডাক এলে তুমি আমি সবাই যাব।

মনিরা মামীমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল বটে কিন্তু তার হৃদয়েও মামুজানের বিরহ-বেদনা তুষের আগুনের মতই ধিকি ধিকি জ্বলছিল। মনের সমস্ত বেদনাকে চাপা দিয়ে আজকাল মনিরা নিজেকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করত, বিশেষ করে মামীমার জন্য তাকে একটু শক্ত হতে হয়েছে। মনিরা প্রথম দিকে নিজেকে প্রকৃতিস্থ রাখতে পারেনি। সব সময় সে নির্জনে বসে বসে কাঁদত। মামুজানই ছিল তাদের ভরসা।

কিন্তু মনিরা জ্ঞানবতী-শিক্ষিতা। সে দেখলো তার চোখের পানি শোকাতুরা মরিয়ম বেগমকে আরও শোকবিহ্বল করে তুলছে। কাজেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে মামীমাকে প্রসন্ন রাখার চেষ্টা করতো।

আজ তাই মনিরা একরকম জিদ করেই মামীমাকে তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। তবু কিছুক্ষণের জন্য এই বদ্ধ হাওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। নানারকম কথাবার্তায় মনে আসবে পরিবর্তন।

মামীমাকে পাঠিয়ে মনিরা নিজের ঘরে বসে একটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। ভাবছিল কত কথা। ছোট বেলায় পিতাকে হারানোর কথা, যদিও তার মনে নেই; কিন্তু বড় হয়ে যখন শুনেছিল তার আব্বা নেই, তখন একটা নিদারুণ ব্যথা তার শিশু অন্তরকে নিষ্পেষিত করে দিয়েছিল। তারপর মাকে হারানোর পালা। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও মনিরার হৃদয়ে হাতুড়ির ঘা পড়ে। সেদিন মনিরা নিজের জীবনকে একটা অপেয় জীবন বলে মনে করেছিল। তার মত অভাগী মেয়ে বুঝি আর এ জগতে নেই।

কিন্তু মামা-মামীমার অপরিসীম স্নেহ আর ভালোবাসার আবেষ্টনী মনিরার অন্তরের আঘাতকে সান্ত্বনার প্রলেপে একদিন ভরে তুলেছিল। হারানো পিতামাতার বঞ্চিত স্নেহনীড়, খুঁজে পেয়েছিল সে মামা আর মামীমার মধ্যে। তারপর মনিরা যখন তার স্নেহময় পিতা আর স্নেহময়ী মায়ের কথা কতকটা ভুলে এসেছে, এমনি সময় তার মাথায় বজ্রাঘাত হল, তার একমাত্র ভরসা মামুজান চিরতরে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

অন্ধকারের অতলে যেন তলিয়ে গেলো মনিরা। বহুদিনের হারানো শোকে জেগে উঠল নতুন করে। সে ভেঙ্গে পড়েছিল– কিন্তু পরে নিজকে সামলে নিল। মামীমার করুণ ব্যথাভরা মুখের দিকে তাকিয়ে সব দুঃখ চেপে গেল মনিরা নিজের মনে।

মামীমার মনকে স্বচ্ছ–স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা করতে লাগল মনিরা। কারণ, এখন তার একমাত্র সম্বল ঐ বৃদ্ধা। সে ভাবল, হঠাৎ যদি তার মামীমার কিছু হয়ে যায় তখন কি হবে। তাকে আগলাবার এ দুনিয়ায় আর যে কেউ নেই।

মনির সে এখন অনেক দূরে। লোকসমাজ থেকে বহু দূরে। তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরে। আলেয়ার আলোর মত তাকে দেখা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না। মনিরের কথা ভাবছে মনিরা, এমন সময় গাড়ি বারান্দায় মোটর থামার শব্দ শোনা গেল। এ সময়ে কে এলো? মনিরা একটু সজাগ হয়।

কক্ষে প্রবেশ করে বাবলু– আপামনি, সেদিনের নতুন সাহেব এসেছেন। ঐ যে সাহেব আপনার সঙ্গে তর্ক করেছিলেন।

বলে দে কেউ বাড়ি নেই। সোজা হয়ে বসে বলল মনিরা।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরা আবার বালিশে ঠেশ দিয়ে বসে বইখানা মেলে ধরল চোখের সামনে। কিন্তু বইয়ের পাতায় মন দিতে পারল না। হঠাৎ অসময়ে গোয়েন্দা মিঃ আলমের আগমন যেন তার সমস্ত চিন্তাধারাকে তচনচ করে দিয়ে গেল।

বাবলু ফিরে এলো—আপামনি, উনি আপনার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে চান

মনিরার দু'চোখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠল, তীব্রকণ্ঠে বলল- বললি না, কেউ নেই?

বলেছি, কিন্তু উনি- বললেন- তোমার আপামনিও কি নেই? আমি বললাম তিনি আছেন, বই পড়ছেন। উনি তখন বললেন- আপনার সঙ্গেই....

ভাগ্ হতভাগা, আমি কারও সঙ্গে দেখা করব না।

কি বলব?

বল্‌গে আপামনি দেখা করতে পারবেন না।

আচ্ছা, তাই বলছি। বেরিয়ে যায় বাবলু।

একটু পরেই ফিরে আসে—আপামনি, উনি বলছেন খুব জরুরী কথা আছে, আপনার সঙ্গে দেখা না করলেই নয়।

মনিরা বিপদে পড়ল। অবশ্য মনিরার পক্ষে এ দেখা করা ব্যাপার তেমন কিছু নয়। কিন্তু আজ মনিরার মন ভাল ছিল না. তাছাড়া বাড়িতে আজ কেউ নেই, সরকার সাহেবও একটু আগে কোন কাজে গেছেন, নকিবটা রয়েছে, সেও রান্নাঘরে। যাক, ওসব চিন্তা করে লাভ নেই। ভয় কি, তিনি তো আর এমন কোন লোক নন, একজন ভদ্রসন্তান। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে কোন অসৎ ব্যবহার করবেন না। উঠে দাঁড়াল মনিরা- যা বলগে আমি আসছি। এই শোন্ ভেতরে বৈঠকখানায় বসাবি, বুঝলি?

বুঝেছি আপামনি। চলে যায় বাবলু।

ভেতর বৈঠকখানায় প্রবেশ করতেই মিঃ আলম মাথার ক্যাপটা খুলে মনিরাকে অভিবাদন জানালেন।

মনিরা শান্তকণ্ঠে বলল—বসুন।

একটু হেসে বলেন মিঃ আলম- অসময়ে বিরক্ত করলাম বলে.....

না না, সময় আর অসময়ের কি আছে? যে অবস্থায় পড়েছি তাতে.....

হাঁ, একটু বিরক্ত হতে হবে বৈকি। মনিরাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে ওঠেন— মিঃ আলম।

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করার পরও মনিরা আসন গ্রহণ করে না। সে একপাশে দাঁড়িয়ে প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরে মিঃ আলমের মুখে।

মিঃ আলমও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে একরাশ ধোঁয়া সামনে ছুড়ে দিয়ে বললেন—মিস মনিরা, আমি আজ একটা জরুরী কথা জানতে এসেছি।

বেশ বলুন।

বসুন না, এমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বলুন কি জানতে চাচ্ছেন?

বসতে সঙ্কোচ করছেন– আমি গোয়েন্দা বিভাগের লোক বলে আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না বুঝি?

না না বসছি। মনিরা মুখে সঙ্কোচ না করলেও মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। এই নির্জন দ্বিপ্রহরে একলা একজন যুবকের পাশে, তবু বাবলুটা রয়েছে বলে ভরসা হয় মনিরার। অবশ্য এ দুর্বলতার কারণ আছে। মনিরা এখন যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে সে অবস্থায় সবাই এমনি হবে। চারদিকে তার বিপদের বেড়াজাল। একদিন মনিরা সবাইকে নিঃসঙ্কোচে বিশ্বাস করত, কিন্তু আজ সে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। সবাই যেন আজ তাদের শত্রু, কেউ যেন তাদের মঙ্গল চায় না।

মিঃ আলম বললেন– কি ভাবছেন মিস মনিরা?

কই কিছু না। আপনি যা জিজ্ঞাসা করতে চান, করতে পারেন।

দেখুন মিস মনিরা, সবাই আপনাদের সম্বন্ধে যাই বলুক আমি তা বিশ্বাস করি না, মানুষের ধারণা এক কিন্তু ঘটনা অন্যরকম হয়। আমি পুলিশের রিপোর্টে জানতে পেরেছি আপনি দস্যু বনহুরকে ভালবাসেন এবং সেই কারণে দস্যু বনহুরও এখানে আসে–মানে আপনাদের এই বাড়িতে তার আগমন হয়।

এ কথাই কি আপনি জানতে এসেছেন?

না মিস মনিরা, আমি জানতে চাই, চারদিকে অন্ধের মত হাতড়ানোর চেয়ে আমরা অতি সহজেই চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য ভেদ করতে পারব, যদি আপনি সঠিক জবাব দেন।

হাঁ, তাকে আমি ভালবাসি।

আপনার মত উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে একটা নগণ্য দস্যুকে ভালবাসতে পারে, আশ্চর্য!

না, সে নগণ্য নয়। দস্যু সে হতে পারে কিন্তু হৃদয় তার অনেক বড়। আমার-আপনার মনের চেয়ে অনেক উঁচু তার মন।

ও, আপনি দেখছি তার প্রেমে একেবারে মুগ্ধ, অভিভূত!

মনিরা নীরব।

বাবলু একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল, কারণ মনিরা তাকে কক্ষে থাকার জন্য ইংগিত করেছিল।

মিঃ আলম বাবলুকে লক্ষ্য করে বললেন–এক গেলাস পানি নিয়ে এসো।

বাবলু বেরিয়ে গেল।

মনিরার বুকটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। বাবলু বেরিয়ে যাওয়ায় কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে।

মিঃ আলম একটু ঝুঁকে মনিরার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন–মিস মনিরা, আপনি সত্য কথা বললে আমি আপনাকে বাঁচিয়ে নিতে চেষ্টা করবো।

এ আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্য। চৌধুরী সাহেবের হত্যার পেছনে দস্যু বনহুরের অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে, এ কথা আপনি জানেন।

আপনার অনুমান মিথ্যা। আপনি যেতে পারেন, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করব না। উঠে পড়ে মনিরা।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আলম মনিরার হাত মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে–বসুন, আরও কথা আছে।

মনিরার হাত স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে মনিরা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ফোঁস্ করে ওঠে—হাত ছাড়ুন।

মিঃ আলম হাত ছেড়ে দেন, তারপর হেসে বলেন—মিস মনিরা, আপনি আমার ওপর রাগ করবেন না। হঠাৎ ভুল হয়ে গেছে।

তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা–ভুল! ছিঃ আপনার মত...

হ্যাঁ, সত্যি আমি বড় অসভ্য।

মনিরা ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল মিঃ আলমের মুখের দিকে। কিন্তু কি আশ্চর্য, সে মুখে নেই এতটুকু পরিবর্তন!

মনিরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে রি-রি করে উঠল। কোন কথা না বলে পুনরায় ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ল সে।

কিন্তু তখন মিঃ আলম উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, মুখে তাঁর মৃদু হাসির রেখা, টেবিল থেকে ক্যাপটা তুলে নিয়ে মাথায় দিয়ে বলেন– মিস মনিরা, আমার যা জানার ছিল জানা হয়ে গেছে। অসময়ে বিরক্ত করলাম, ক্ষমা করবেন। আসি তবে...বেরিয়ে যান মিঃ আলম।

মনিরার দু'চোখে তখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছিল। রাগে-ক্ষোভে গজ্ গজ্ করছিল। মিঃ আলমের কথার কোন উত্তর দিল না সে।

গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটর স্টার্টের শব্দ শোনা গেল। এমন সময় বাবলু ট্রে হাতে কক্ষে প্রবেশ করল। এক গ্লাস পানি আর প্লেটভরা নাস্তা। কক্ষের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বলল-আপামনি, উনি কোথায়?

মনিরা কঠিন কণ্ঠে ধমক দিল—ভাগ্ হতভাগা!

বাবলু মনে করল, তার পানি আনতে দেরী হয়েছে, তাই রেগে গেছেন আপামনি। মুখটা কাঁচুমাচু করে বলল—আপনি তো একদিন বলেছেন, কেউ পানি চাইলে যেন শুধু পানি এনে না দিই। তাই আমি.....

মনিরা আর কথা না বলে উঠে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে যায়। বাবলু হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরার চলে যাওয়া পথের দিকে।

❑

মনিরা কক্ষে ফিরে এসেও স্বাভাবিক হতে পারে না। বারবার সে নিজের দক্ষিণ হাতখানা দুমড়ে-মুচড়ে, ঝেড়ে-মুছে ফেলে। এখনও তার হাতে যেন মিঃ আলমের হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। ছিঃ ছিঃ এরাই দুনিয়ার সভ্য মানুষ। একটা মেয়েকে একলা নিঃসঙ্গ পেয়ে তাকে এভাবে অপদস্থ করতে পারে! এত সাহস তার হাতে হাত রাখে! অধর দংশন করে মনিরা।

এমন সময় মরিয়ম বেগম ফিরে আসেন বোনের বাড়ি থেকে।

সরকার সাহেবও এসে পড়েন।

মনিরার রাগ যেন আরও বেড়ে যায়। এতক্ষণ কেউ আসতে পারেনি? এমন কি সরকার সাহেব থাকলেও মনিরা কিছুতেই যেত না মিঃ আলমের সঙ্গে দেখা করতে।

মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে ডাকলেন—মা মনি- মনিরা এগিয়ে এলো—কি বলছ মামীমা?

শুনলাম মিঃ আলম এসেছিল?

হ্যাঁ, এসেছিলেন।

কি বললেন তোকে?

জানি না!

সেকি, তিনি কেন এসেছিলেন, কি জিজ্ঞাসা করলেন বলবি না?

নতুন কোন কথা নয়, সেদিন তিনি যা প্রশ্ন করেছিলেন আজও তাই করছিলেন। আমাকে ফুসলিয়ে তিনি জানতে এসেছিলেন মামুজানের হত্যারহস্য আমি জানি কিনা।

মরিয়ম বেগম আজ একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রাগত কণ্ঠে বললেন– ভদ্রলোকের সন্দেহের সীমা নেই দেখছি। এবার ঐরকম কোন প্রশ্ন করলে সোজা বলে দিবি–আমি কোন জবাব দেবো না।

মনিরা বলে উঠে—এরপরও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব– কখ্খনো না। মামীমা, আজ তার যা আচরণ পেয়েছি, তা বলতে লজ্জা হয়। সে আমার হাত ধরে বসিয়ে দিতে যায়—এত সাহস তার!

মনিরার কণ্ঠস্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন–কি করবি মা, সবই আমাদের অদৃষ্ট। আজ তোর মামুজান বেঁচে থাকলে কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে সাহসী হত না। আর আজ....মনিরা, মা আমার, কি বলব, আজ সবাই আমাদের অবহেলা করে, হেয় মনে করে.... মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছেন। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন তিনি–মনি, একটা কথা বলব তোকে?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে তাকায় মনিরা মামীমার মুখের দিকে।

আয় মা, আমার ঘরে আয়।

মনিরা মামীমাকে অনুসরণ করে। না জানি কি বলতে চান তিনি। মনের মধ্যে নানা প্রশ্ন একসঙ্গে আলোড়ন জাগায়। মামীমাই এখন তার একমাত্র অভিভাবক। তিনি যা বলবেন তাই করতে হবে। যা বলবেন তাই শুনতে হবে।

মামীমার কক্ষে প্রবেশ করে মুখোমুখি বসল দু'জন। মরিয়ম বেগম ভাগ্নীর কপালের এলোমেলো চুলগুলো সযত্নে সরিয়ে দিয়ে বললেন— মনি এখন তুমি অনেক বড় হয়েছে। শিক্ষিত মেয়ে তুমি। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না আমার, এখন তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে।

মনিরার মনটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠল। কি বলতে চান মামীমা।

মরিয়ম বেগম একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—যা ভেবেছিলাম তা হবার নয়। বড় আশা ছিল, তোকে কাছে ধরে রাখবো! কিন্তু হল না---- মনির আমার সব আশা-ভরসা নষ্ট করে দিয়েছে।

মনিরার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হল। সরল সহজ মামীমাকে আজ এত ভূমিকা করতে দেখে বুঝতে কিছু বাকি থাকে না মনিরার।

মরিয়ম বেগম বলে চলেন–খালেদার ছেলেটা এবার ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে মস্তবড় চাকরি পেয়েছে। দেখতে শুনতে খুব সুন্দর। আমারই বোনের ছেলে তো-আমার মনিরের মতই তার চেহারা।

মনিরার মুখমণ্ডল মুহূর্তে কালো হয়ে উঠল। জলভরা আকাশের মত ছলছল করে উঠল তার চোখ দুটো। অসহায়ার মত তাকাল সে মামীমার মুখের দিকে।

মনিরার হৃদয়ের ব্যথা বুঝতে পারেন মরিয়ম বেগম। তাঁর নিজের মনেও কি কম দুঃখ! কোনদিন যে মনিরাকে দূরে সরাবেন, এ কথা মরিয়ম বেগম ভাবতেই পারেননি। তাঁর মন আকুল হয়ে কেঁদে ওঠে। মনিরাকে যে পরের ঘরে পাঠাতে হবে, এ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে।

মনিরা সম্বন্ধে মরিয়ম বেগম যে চিন্তা করেননি তা নয়। অনেকদিন নিরালায় বসে ভেবেছেন, মনিরা এখন ছোট নেই। তার বয়সে মরিয়ম বেগমের কোলে মনির এসে পড়েছিল। কাজেই এখন আর নিশ্চুপ থাকার সময় নয়। মনিরা সম্বন্ধে একটা কিছু ব্যবস্থা না করলেই চলবে না।

একমাত্র সন্তান মনির—কিন্তু সে আজ লোকসমাজের বাইরে। তার সঙ্গে মনিরার বিয়ে হওয়া অসম্ভব। নিজে যে দুঃখ, যে বেদনা অহরহ ভোগ করেছেন, সে জ্বালা আর একটা অবলা সরলা মেয়ের ঘাড়ে চাপাতে পারেন না তিনি।

তাই আজ মনস্থির করে ফেলেছেন মনিরার বিয়ে দেবেন অন্য একটা ছেলের সঙ্গে। বোন খালেদার ছেলেকে দেখে আজ তাঁর হৃদয়ে সেই বাসনাটা প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে। উপযুক্ত ছেলে কাওসার–মনিরার সঙ্গে সুন্দর মানাবে। যেমন চেহারা তেমনি তার ব্যবহার।

মরিয়ম বেগম কাওসারকে ছোটবেলায় দেখেছিলেন—ফুটফুটে সুন্দর চেহারা। মনির আর কাওসারকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলেছিলেন মরিয়ম বেগম-দেখ খালেদা, এদের দু'জনকে দেখলে ঠিক যেন যমজ ভাই বলে মনে হয়।

হেসে বলেছিল খালেদা–তোমার ছেলে আর আমার ছেলে যে এক হবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে। কাওসার তো তোমারই ছেলে আপা!

সেই কাওসার আজ উচ্চশিক্ষা লাভ করে মানুষের মত মানুষ হয়েছে, আর তার মনির আজ কি হয়েছে?–লোকসমাজে তার কোন স্থান নেই!

মনিরা নিশ্চুপ। পাথরের মূর্তির মতই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

মরিয়ম বেগম গভীর স্নেহে টেনে নিলেন ওকে কাছে–মা, জানি তুই ঐ হতভাগাকে ভালবাসিস্। কিন্তু... সে আমার সন্তান হলে কি হবে, ওর হাতে আমি তোকে তুলে দিতে পারব না। না না, কিছুতেই তা সম্ভব নয়। মনিরা

বল্ আমার কথা রাখবি। আমি খালেদাকে কথা দিয়ে এসেছি, কাওসারের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব....

মামীমা! আর্তস্বরে বলে ওঠে মনিরা।

হ্যাঁ, আমি তোকে পরের হাতে সঁপে দিতে পারব তবু তোর ফুলের মত জীবনটাকে বিনষ্ট করতে পারব না।

মামীমা, তুমি জানো না....

সব জানি মনিরা সব জানি। কিন্তু কোন উপায় নেই। মনিরকে তোর ভুলতে হবে।

মামীমা!

আমি পাষাণের চেয়েও কঠিন হবো। যত আঘাতই আসুক না কেন, সব আমি সহ্য করব। হঠাৎ মরিয়ম বেগম চিৎকার করে ডাকেন– সরকার সাহেব, সরকার সাহেব!

হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেন সরকার সাহেব–আমায় ডাকছেন বিবি সাহেবা?

হ্যাঁ। শুনুন সরকার সাহেব, আমি মনিরার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। আমার চাচাতো বোন খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে। আপনি বিয়ের সব আয়োজন করুন।

আচ্ছা বিবি সাহেবা। কবে থেকে বিয়ের আয়োজন শুরু করব?

কাল। কাল থেকেই আপনি কাজ শুরু করুন। বাড়িঘর সমস্ত হোয়াইট ওয়াশ করিয়ে নিন। দরজা জানালা সব নতুন রঙ করাবেন। পুরানো পর্দা সরিয়ে নতুন পর্দার ব্যবস্থা করুন! চৌধুরী সাহেব মরে গেছেন বলে আমিও মরিনি। আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ে মনিরা চোখের পানি ফেলবে—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। ওকে যদি আমি সুখী করতে না পারি তাহলে আমি মরেও শান্তি পাব না।

ওর মা মৃত্যুকালে ওকে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলে গেছে–মনিরাকে সুখী করো ভাবী। রওশন আরার সেই মৃত্যুকালের শেষ কথা আমি কোন দিন ভুলব না। নিজের সুখ-সুবিধার জন্য ওকে আমি সাগরে ভাসাতে পারি না

সরকার সাহেব মাথা দোলালেন—আপনি ঠিক বলেছেন বিবি সাহেবা, এখন মা মনির বিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার। পাড়া-প্রতিবেশীরা এ নিয়ে অনেক কথাই বলে, তাদের মুখে যেন কালি পড়ে।

পাড়া-প্রতিবেশীদের কথাবার্তা শুনে শুনে কান আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে। মেয়ে বড় হয়েছে আমার হয়েছে তাতে অন্যের কি? চৌধুরী সাহেব

বেঁচে থাকতে যারা 'টু' শব্দটি করতে সাহসী হয়নি, আজ তারা আমাদের সম্বন্ধে যা-তা বলতে শুরু করেছে। যাক, এবার আমি সকলের কথার শেষ করব; মনিরার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব।

মরিয়ম বেগম মুখে যতই বলুন না কেন, শেষ পর্যন্ত তিনি মনিরাকে খালেদার ছেলে কাওসারের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলেন না। মনকে যতই কঠিন করবেন ভেবেছিলেন সব ভেসে গেলো—অদৃশ্য মায়ার বন্ধন মরিয়ম বেগমের সমস্ত অন্তর আচ্ছন্ন করে ফেলল।

তিনি সব ছাড়তে পারেন কিন্তু মনিরাকে ত্যাগ করতে পারেন না।

পরদিন ভোরে নামাযান্তে সরকার সাহেবকে ডেকে বললেন–মনিরার বিয়ে আমি দেব না সরকার সাহেব। অযথা ঘরদোর নতুন করে সাজাবার আমার কোন দরকার নেই।

সরকার সাহেব সব বুঝতে পেয়ে মৃদু হাসলেন, তারপর চলে গেলেন নিজের কাজে।

❑

বনহুরের মাথায় পাগড়ীটা পরিয়ে দিয়ে হেসে বলল নূরী—জানি তুমি ছায়ামূর্তির সন্ধানে চলেছ।

হ্যাঁ নূরী, পুলিশমহল যে ছায়ামূর্তির সন্ধানে ঘাবড়ে উঠেছে—আমি তাকে খুঁজে বের করতে চাই।

সত্যি হুর, বড় আশ্চর্য! কে এই ছায়ামূর্তি? ছায়ামূতি যে অত্যন্ত চালাক এবং ধূর্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সে কারণেই তো আজও পুলিশ তাকে গ্রেফতারে সক্ষম হয়নি।

তুমি কোথায় পাবে তার সন্ধান?

দস্যু বনহুরের চোখে ধুলো দিতে পারে এমন ছায়ামূর্তি আছে? নূরী, ছায়ামূর্তি যেই হোক, আমি তাকে পাকড়াও করবোই। কিন্তু সাবধান, ছায়ামূর্তি যেন এখানে এসে হাজির না হয়।

হেসে বলে নূরী—হুর, তোমার আস্তানায় আসাবে ছায়ামূর্তি? এত সাহস হবে তার? সিংহের গহ্বরে শৃগালের প্রবেশ----

আচ্ছা, আমি চললাম। খোদা হাফেজ! বনহুর নূরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায়।

বনহুর চলে যেতে নূরী ফিরে দাঁড়ায়, বনহুরের পরিত্যক্ত শয্যায় গা এলিয়ে দিয়ে দু'চোখ বন্ধ করে। মনের কোণে ভেসে ওঠে বনহুরের সুন্দর মুখখানা। কানের কাছে ভাসে তার কণ্ঠস্বর।

নূরী উঠে বনহুরের ছোরাখানা তুলে নেয় হাতে, বুকে চেপে ধরে অনুভব করে তার স্পর্শ।

হঠাৎ পেছনে একটা শব্দ হয়! চমকে ফিরে তাকায় নূরী। মুহূর্তে তার চোখ দুটো ছানাবড়া হয়।

নূরী দেখতে পায়, একটা অদ্ভুত কালো আলখেল্লায় সমস্ত শরীর ঢাকা ছায়ামূর্তি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

নূরী হতবাকের মত তাকিয়ে থাকে।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে।

নূরী চিৎকার করে ওঠে—কে তুমি?

ছায়ামূর্তি! চাপা অস্ফুট কণ্ঠে বলে ছায়ামূর্তি।

ছায়ামূর্তি তুমি! কি চাও এখানে?

আমি জান নিতে এসেছি।

জান?

হ্যাঁ, তোমার নয়—দস্যু বনহুরের।

নূরী দু'পা সরে দাঁড়ায়, সাহস সঞ্চয় করে বলে—শয়তান, জানো তুমি কোথায় এসেছ?

দস্যু বনহুরের বিশ্রামকক্ষে।

এখানে তুমি কেমন করে প্রবেশ করলে?

ছায়ামূর্তির প্রবেশ সর্বক্ষণ সর্বস্থানে অতি সহজ.... একটু থেমে বলে ছায়ামূর্তি—এতক্ষণ তোমার আর দস্যু বনহুরের মধ্যে যে কথাবার্তা হলো সব আমি শুনেছি!

শয়তান! তবে কার ভয়ে লুকিয়ে ছিলে। তখন এখানে প্রবেশ করতে পারলে না? দস্যু বনহুর তোমায় উচিত সাজা দিয়ে তবেই ছাড়ত। এসেছ একটা নারীর কাছে বাহুবল দেখাতে? নূরী দ্রুত পদক্ষেপে দরজার সম্মুখে গিয়ে হাতের ছোরাখানা বাড়িয়ে ধরে—খবরদার, এক-পা এগুলে আমি তোমাকে হত্যা করব।

ছায়ামূর্তি চাপাস্বরে হেসে ওঠে—হাঃ হাঃ হাঃ ছায়ামূর্তিকে তুমি হত্যা করবে? এসো তবে ছায়ামূর্তি এগুতে থাকে নূরীর দিকে।

ক্রুদ্ধ নাগিনীর ন্যায় ফোঁস ফোঁস করছিল নূরী। রুখে দাঁড়ায়–শয়তান! সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বসিয়ে দিতে যায় সে ছায়ামূর্তির বুকে।

মুহূর্তে ছায়ামূর্তি নূরীর হাতখানা বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় চেপে ধরে। অতি সহজেই নূরীর হাতি থেকে ছোরাখানা খসে পড়ে মেঝেতে।

এবার হাত ছেড়ে দেয় ছায়ামূর্তি, তারপর আবার সে হেসে ওঠে অট্টহাসি।

নূরী থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছায়ামূর্তি হাসি থামিয়ে বলে—বনহুরের জীবন যদি বাঁচাতে চাও, তবে তাকে আমার অন্বেষণ থেকে ক্ষান্ত কর। নচেৎ আবার আসব .....কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নূরী ছুটে গিয়ে বিপদ সংকেত ঘণ্টাধ্বনি করে।

মুহূর্তে সমস্ত দস্যু এসে জড়ো হয় নূরীর চারপাশে।

নূরী সকলকে লক্ষ্য করে বলে–ছায়ামূর্তি! এই মুহূর্তে এখানে ছায়ামূর্তি এসেছিল— যাও, তোমরা শিগগির তাঁর অনুসন্ধান কর। যাও।

সমস্ত অনুচরের চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ল-আশ্চর্য! তাদের এত সাবধানতা সত্ত্বেও কি করে এখানে ছায়ামূর্তি প্রবেশ করলো! সবাই ছুটলো চারদিকে। আস্তানা তন্নতন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

❑

ভোরের দিকে তাজের পদশব্দে নূরীর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

গোটারাত নূরীর নিদ্রা হয়নি, এই অল্পক্ষণ সে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাজের শব্দ তার অতি পরিচিত। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে ছুটে গেল সে বনহুরের কক্ষে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করেই নূরীকে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হল, হেসে বলল–এখনও ঘুমোওনি নূরী?

নূরী তার কথার কোন জবাব না দিয়ে বলে—হুর, জানো কি ঘটেছে? তুমি যা বলেছিলে তাই?

কি বলেছিলাম?

ছায়ামূর্তি! সেই ছায়ামূর্তি এসেছিল.....

ছায়ামূর্তি এসেছিল, বল কি নূরী!

হ্যাঁ, কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা। তেমনি অসুরের মত শক্তি তার দেহে।

তার চেহারাও দেখেছ। তার শক্তিও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে দেখছি।

সব বলছি হুর, শোনো। সে তোমার জীবন নিতে এসেছিল!

আমার জীবন?

হ্যাঁ, তোমার জীবন। তুমি যদি ছায়ামূর্তির অনুসন্ধানে ক্ষান্ত না হও, তবে—

আমার জীবন নেবে সে—এই তো?

আমি ওকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমার হাত মুঠায় চেপে ধরে....

ছোরাখানা কেড়ে নিয়েছে—এই তো?

তুমি ঠাট্টা করছ হুর! আমার ভয় হচ্ছে, শয়তানটা তোমার না কিছু করে বসে।

ভয় নেই নূরী, ছায়ামূর্তির সাধ্য কি তোমার হুরের গায়ে হাত দেয়।

সত্যি তুমি কত শক্তিশালী! হুর, তোমার দিকে চাইলে আমি গোটা দুনিয়াটাকে ভুলে যাই। তোমার মত পুরুষ বুঝি দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

নূরী, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাই তুমি এ কথা বলতে পারলে।

হুর! অস্ফুট শব্দ করে বনহুরের বুকে মাথা রাখে নূরী, তারপর আবেগভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ তুমি এ কথা স্বীকার করলে! আমার ভালবাসার আঁচ এতদিনে অনুভব করলে তুমি। হুর, আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

নূরী! বনহুর নূরীর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়।

গভীর আবেগে নূরী বনহুরের বুকে মুখ গুঁজে চোখ বন্ধ করে। এমনি করে সে যদি চিরদিন হুরের বুকে মাথা রেখে কাটিয়ে দিতে পারত! পৃথিবীর আর কোন সুখ সে চায় না–শুধু চায় এইটুকু।

মানুষ যা চায় তা সবসময় পায় না। তাই নূরীরও এই সুখ, এই অনাবিল আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না।

হঠাৎ বনভূমি প্রকম্পিত করে বেজে ওঠে বিপদ সঙ্কেতধ্বনি।

বনহুর তাড়াতাড়ি নূরীকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নিজের অজ্ঞাতে তার দক্ষিণ হাতখানা বেল্টে ঝুলান রিভলভারের গায়ে গিয়ে ঠেকে। সচকিত হয়ে ওঠে বনহুর।

নূরী উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বলে–নিশ্চয়ই আবার সেই ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছে।

তক্ষুণি রহমত হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করে—সর্দার, পুলিশ?

বনহুর মুহূর্তে ফিরে দাঁড়াল–পুলিশ?

হ্যাঁ সর্দার। পুলিশ ফোর্স অস্ত্রশস্তে সজ্জিত হয়ে এগিয়ে আসছে।

রহমত?

সর্দার?

পুলিশ আমার আস্তানার সন্ধান কি করে পেল?

সর্দার, এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে!

কিন্তু এখন ওসব আর ভাববার সময় নেই, আমার অনুচরদেরকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বল। একটা পুলিশও যেন ফিরে না যায়। আর শোনো, আমার ভূগর্ভ সুড়ঙ্গমুখ খুলে রাখ, প্রয়োজন হলে.....

যাও।

রহমত দ্রুত বেরিয়ে যায়।

নূরী শঙ্কিত কণ্ঠে বলে ওঠে—হুর, এখন উপায়?

নূরী, শিগ্‌গির তুমি ভুগর্ভ সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যাও। আর এক মুহূর্ত এখানে বিলম্ব করো না।

হুর, তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না।

নূরী যাও। বনহুর চিৎকার করে ওঠে!

ওদিকে গুড়ুম গুড়ুম করে রাইফেল গর্জে ওঠার শব্দ হচ্ছে।

নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে—তুমিও চলো হুর, নইলে আমি যাব না।

নূরী!

বনহুরের কঠিন কণ্ঠস্বরে নূরীর হৃদয় কেঁপে ওঠে, দু'চোখে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। একবার বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় সে।

বনহুর উদ্যত রিভলভার হাতে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে।

শুরু হয় পুলিশ আর দস্যুদলে ভীষণ যুদ্ধ!

বনহুর নিজেও লড়াই করে চলল। হত্যার উল্লাসে তার চোখের তারা দুটি নেচে উঠল। মুহূর্তে মুহূর্তে গর্জে উঠতে লাগল বনহুরের রিভলভার।

অসংখ্য পুলিশ নিহত হল। অসংখ্য দস্যু নিহত হলো।

লালে লাল হয়ে উঠলো বনভূমি।

পূর্বাকাশ আলো করে সূর্যদেব উঁকি দিয়েছে। যুদ্ধ তখন থেমে এসেছে, পুলিশ ফোর্স দিনের আলোয় দেখল—কিছু সংখ্যক মৃতদেহ ছাড়া আর একটা প্রাণীও নেই সেখানে।

সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খোঁজা হল।

আস্তানার ঘর-দোর ভেংগেচুরে আগুন ধরিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলা হল। কিন্তু দস্যু বনহুরের সন্ধান মিলল না।

এবার পুলিশ ফোর্স ফিরে চলল।

এত প্রচেষ্টা সব তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হারুন স্বয়ং পরিচালনা করেছিলেন পুলিশবাহিনীকে। এমন কি তাঁরা বিপুল

পুলিশবাহিনীসহ দস্যু বনহুরের আস্তানা অবধি হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু যার জন্য তাদের এত পরিশ্রম তাকে পাকড়াও করতে পারলেন না।

মিঃ জাফরী সিংহের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন। রাগে-দুঃখে অধর দংশন করছেন। দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান পেয়ে তাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলেন না। এতবড় পরাজয় আর কোনদিন তাঁর হয়নি।

দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান মিঃ জাফরী তাঁর বিশ্বস্ত সহকারীর নিকট পেয়েছিলেন। মিঃ জাফরীর সহকারী মিঃ মুঙ্গেরী এখানে আসার পর হঠাৎ অন্তর্ধান হয়ে গিয়েছিলেন, মিঃ মুঙ্গেরীর অন্তর্ধানে মিঃ জাফরী মনে মনে রাগান্বিত ছিলেন; কিন্তু তিনি মনোভাব গোপন রেখে প্রতীক্ষা করছিলেন, হতে পারে তিনি কোন গোপন রহস্য উদঘাটনে অদৃশ্য হয়েছেন। মিঃ জাফরী যখন মিঃ চৌধুরী, ডক্টর জয়ন্ত সেন এবং ভগবৎ সিংয়ের হত্যারহস্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন, এমন দিনে হঠাৎ এক গভীর রাতে মিঃ মুঙ্গেরী সশরীরে উপস্থিত হলেন।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—ব্যাপার কি? হঠাৎ গা ঢাকা দেবার কারণ?

মিঃ মুঙ্গেরী একগাল হেসে বললেন–আপনি তো স্যার হত্যা হস্য নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু ওদিকে বনহুরকে পাকড়াওয়ের কি করলেন?

ওঃ তুমি বুঝি তাহলে দস্যু বনহুরকে পাকড়াও করতে মনোনিবেশ করেছ?

হ্যাঁ স্যার, শুধু মনোনিবেশ করিনি, একেবারে..... একটু থেমে গলার স্বর খাটো করে নিয়ে বলেছিলেন মিঃ মুঙ্গেরী–একেবারে দস্যু বনহুরের আস্তানার সন্ধান এনেছি।

মিঃ জাফরীর দু'চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল, আগ্রহভরা কণ্ঠে বললেন–সত্যি বলছ মুঙ্গেরী?

ইয়েস স্যার! আপনি তো জানেন, মুঙ্গেরী যে কাজে মনোনিবেশ করে সে কাজ যতক্ষণ না সমাধা হয় ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

হ্যাঁ, তাহলে তো অত্যন্ত সুখবর এনেছ মুঙ্গেরী। দস্যু বনহুর গ্রেফতার হলে তোমার সুনাম দেশবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। সরকার বাহাদুর মোটা পুরস্কারও দিবেন।

মিঃ মুঙ্গেরী মিঃ জাফরীর কথায় কান না দিয়ে বলেছিলেন—স্যার, আর বিলম্ব নয়, আজই আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে আমরা দস্যু বনহুরের আস্তানায় হানা দেব। কথা বলতে মুঙ্গেরীর মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। বলিষ্ঠ বাহু দু'টি মুষ্টিবদ্ধ হয়।

মিঃ জাফরী মুঙ্গেরীর মুখোভাব লক্ষ্য করে সন্তুষ্ট হন। তিনি জানেন মুঙ্গেরী বৃথা কোন কথা বলে না। মুঙ্গেরীর ওপর তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ তাঁর গোপন আলাপ-আলোচনা হলো।

মুঙ্গেরীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। মিঃ জাফরী পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাতের অন্ধকারে দস্যু বনহুরের আস্তানায় পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং ঠিকভাবেই কাজ করে গিয়েছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দস্যু বনহুরের বহু অনুচর নিহত হয়েছে। এত দস্যু নিহত করেও মিঃ জাফর এবং মুঙ্গেরীর মনে শান্তি নেই! যতক্ষণ দস্যু বনহুরকে তাঁরা গ্রেফতার করতে সক্ষম না হয়েছেন ততক্ষণ তাঁরা নিশ্চিত নন।

শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে চললেন পুলিশ অফিসারগণ ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।

❑

পুলিশ বাহিনী যখন ফিরে চলেছে, তখন বনহুর তার ভূগর্ভস্থ দরবার কক্ষে ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে। সামনে দণ্ডায়মান রহমত আর কয়েকজন অনুচর। কয়েকজন আহত অনুচরকে দরবারকক্ষে একটা কম্বলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে।

নূরী বনহুরের একপাশে দণ্ডায়মান, তার পাশেই তার সহচরীগণ, সকলেরই মুখমণ্ডলই গম্ভীর, বিষণ্ন।

আহত অনুচরগণ করুণ আর্তনাদ করছে। কয়েকজন সুস্থ দস্যু তাদের সেবাযত্ন করছে। কেউ বা ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিচ্ছে, কেউ বা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে।

কক্ষে সবাই নীরব।

শুধু দস্যু বনহুরের বুটের আওয়াজ আর আহত দস্যুগণের করুণ আর্তনাদ ছাড়া কারও মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ বলে ওঠে রহমত–সর্দার, পুলিশ কি করে আমাদের আস্তানার সন্ধান পেলো বুঝতে পারছিনে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বলে–এ প্রশ্ন আমার মনেও জাগছে রহমত।

সর্দার আমি শুনেছি পুলিশ ইন্সপেক্টার জাফরী নাকি অত্যন্ত ধূর্ত।

সে শুধু ধূর্ত নয়, শিয়ালের মত চতুর। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কে তাঁকে আমার আস্তানার সন্ধান দিয়েছে।

নূরী এবার বলে—নিশ্চয়ই সেই ছায়ামূর্তি।

হ্যাঁ সর্দার, আমাদেরও তাই মনে হয়–কোন গুপ্তচর ছায়ামূর্তির বেশে আমাদের আস্তানার সন্ধান নিয়ে গেছে।

বনহুর নীরবে কিছু চিন্তা করছিল, এমন সময় একজন অনুচর যন্ত্রণার আর্তনাদ করে উঠলো–সর্দার.... সর্দার.....

বনহুর ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে গেলো আহত অনুচরটার পাশে। হাঁটু গেড়ে বসলো, ওর বুকে হাত বুলিয়ে বললো- তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

হ্যাঁ সর্দার, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। সর্দার, আমি আর সহ্য করতে পারছি না.....

বনহুরের পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হলো, তার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল দুফোঁটা অশ্রু। বনহুর নিজ হাতে ওর ক্ষতস্থানে ঔষধ লাগিয়ে দিতে লাগল।

বনহুরের অনুচরদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নিহত আর আহত হয়ে ছিল। বনহুরের আস্তানার ক্ষতি হওয়ায় যতটুকু ব্যথিত সে না হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ পেয়েছিল তার বিশ্বস্ত অনুচরগণের মৃত্যুতে।

বনহুর অত্যন্ত ভালবাসতো তার এই অনুচরগণকে। নিজের জীবনকে সে তুচ্ছ করে দিত, তবু তাদের প্রতি কোন অন্যায় আচরণ সহ্য করতে পারতো না।

কিন্তু বনহুর তার অনুচরদের বিশ্বাসঘাতকা বরদাস্ত করতে পারত না। যার মধ্যে সে অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পেত তাকে সে কুকুরের মত গুলি করে হত্যা করত।

আজ বনহুর আর নূরী তাদের ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে নিজ হাতে অনুচরগণের সেবাযত্ন করে চলল।

❑

মনিরা কি যেন কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, এমন সময় মরিয়ম বেগম এসে বললেন-মনিরা, একবার আমার ঘরে এসো।

মামীমার কণ্ঠস্বরে মনিরা মুখ তুলে তাকায়, গম্ভীর থমথমে কণ্ঠস্বর মামীমার। হঠাৎ কি হয়েছে তাঁর! অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মনিরা তাঁর মুখের দিকে, তারপর বলে–আসছি মামীমা।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

মনিরা বেশ চিন্তিত হয়, এমনভাবে তো তার মামীমা কোনদিন কথা বলেন না। তাড়াহুড়া করে হাতের কাজ শেষ করে মামীমার ঘরে যায় মনিরা। মনিরা কক্ষে প্রবেশ করেই ধমকে দাঁড়াল। দেখতে পায়, মামীমা গম্ভীর বিষণ্ন মনে খাটের একপাশে বসে আছেন। চোখ দু'টো তার অশ্রু ছলছল বলে মনে হলো মনিরার।

মামীমার মুখোভাব লক্ষ্য করে তার মনটাও কেমন যেন বিষণ্ন হলো। এগিয়ে গিয়ে বলল—কি বলছিলে মামীমা?

মরিয়ম বেগম কোন কথা না বলে একখানা চিঠি এগিয়ে দেন মনিরার দিকে–পড়ে দেখো।

মনিরা চিঠি হাতে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। তার বড় চাচা আসগর আলী সাহেব লিখেছেন। হঠাৎ তাঁর চিঠি দেবার কারণ কি? এতদিন তো তার বড় চাচা আসগর আলী মনিরার কোন খোঁজ-খবর নেননি? মনিরা তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পড়তে শুরু করে, আসগর আলী সাহেব লিখেছেন–

–মা মনিরা, অনেক দিন তোমার খোঁজ-খবর নিতে পারিনি, সেজন্য আমি দুঃখিত। অবশ্য আমি তোমার সংবাদ সব সময় রেখেছি। মামা মামীর নিকটে কুশলেই আছ জেনে কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আমি বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। কারণ এখন তোমার মামুজান নেই, তোমার সমস্ত দায়িত্বভার যিনি গ্রহণ করেছিলেন তিনি আজ পরপারে। মামীমা মেয়ে মানুষ, নিজেই এখন অভিভাবকহীন–অসহায়। তুমি আগের মত আর ছোট নেই, তাই তোমাকে নিয়ে আমি বেশ ভাবনায় আছি। তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে—আমার নিজের মেয়েও যা, তুমিও তাই–তোমার ভাল-মন্দ সব আমাকেই দেখতে হবে, কাজেই আমি এখন তোমাকে আমাদের এখানে নিয়ে আসতে চাই। আমার বিশ্বাস, এতে তুমি অমত করবে না। তোমার মামীমাও নিশ্চয়ই রাজী হবেন। ইতি–

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী–
বড় চাচা

চিঠিখানা পড়া শেষ করে মনিরা স্তব্ধ হয়ে গেল। এবার বুঝতে পারল, কেন তার মামীমার মুখোভাব এমন হয়েছে, কেন তিনি কোনো কথা বলতে পারছেন না। মনিরা পরপর দু'বার চিঠিখানা পড়লো, তারপর চিঠিখানা ভাঁজ করে হাতের মুঠায় চেপে ধরল।

মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন–সত্যিই তুই আমাকে ছেড়ে যাবি মনি?

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে মনিরা—তুমি এ কথা ভাবতে পারলে মামীমা? মনিরা মরিয়ম বেগমের পাশে গিয়ে বসল। তারপর ছোট্ট বালিকার মত মামীমার হাত নিয়ে নাড়াচড়া করতে করতে বলল–মামীমা, তুমি বিশ্বাস করো, কোনদিন আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মনিরা, তুই ছেড়ে যাবি না বলছিস কিন্তু জানিস না মা তোর বড় চাচা আসগর আলী সাহেবকে, তিনি যা বলবেনযা ভাববেন—তা করবেনই।

আমি তাঁকে চিনি না, জানি না, তিনি যদি আমার হিতাকাঙ্ক্ষীই হবেন। তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই এসে আমাকে দেখেশুনে যেতেন।

কি করবি মা, আমাদের চেয়ে তোর ওপর তাঁদের দাবী অনেক বেশি। তিনি যদি তোকে জোর করে নিয়ে যান তবে আমরা তোকে ধরে রাখতে পারব?

কেন পারবে না মামীমা, কেন পারবে না। আমি কি তোমাদের মেয়ে নই?

মাতৃকূলের কাছে পিতৃকূলের দাবী অনেক বেশি। তোর উপর আমার যে কোন দাবী নেই মা। মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ চাপা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে যায়।

মনিরার মুখমণ্ডল কঠিন হয়ে ওঠে। তীব্রকণ্ঠে বলে মনিরা–আমি তাদের দাবী স্বীকার করি না। যারা এতদিন ভুলেও আমার ছায়া মাড়ায়নি, আজ তারা এসেছে পিতৃকূলের দাবী নিয়ে। না না, কিছুতেই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না–যেতে পারি না।

মনিরা, পিতৃকূলের দাবীকে অস্বীকার করলেও একদিন আসগর আলী সাহেব সশরীরে চৌধুরী বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে এসেছে তাঁর দু'জন আরদালী আর একজন আত্মীয় ভদ্রলোক। আসগর আলী সাহেব বজরায় এসেছেন–উদ্দেশ্য মনিরাকে তিনি নিয়ে যাবেন। কিন্তু মনিরা আসগর আলী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই এলো না। নিজের ঘরে চুপ করে শুয়ে রইল।

মরিয়ম বেগম কিন্তু মনের দুঃখ প্রকাশ না করে নিজের সাধ্যমত আদর যত্ন করতে লাগলেন। মরিয়ম বেগমের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হলেন আসগর আলী সাহেব। কিন্তু তিনি এতক্ষণও মনিরাকে না দেখতে পেয়ে চঞ্চল হলেন। মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলেন–ভাবী, মনি কোথায়? ওকে তো দেখছি না?

মরিয়ম বেগম বললেন–শরীরটা খারাপ, তাই শুয়ে আছে।

গম্ভীর হয়ে পড়লেন আসগর আলী সাহেব, বললেন–শরীর খারাপ আজই হলো, না আগে থেকেই ছিল?

আমতা আমতা করে বললেন মরিয়ম বেগম–হঠাৎ আজ ক'দিন ওর শরীরটা...

খারাপ যাচ্ছে, এই তো? মনে হয় আমার চিঠি পাবার পর থেকে। কিন্তু মনে রাখবেন ভাবী, ওকে আমি নিয়ে যাবই। আমার ছোট ভাইয়ের মেয়ে, আপনার চেয়ে ওর ওপর আমার দায়িত্ব অনেক বেশি।

তা জানি। কিন্তু....

কিন্তু নয়, এখন মনিরা আগের মত কচি খুকী নেই। বয়স হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে।

তা ঠিক।

আপনিই বলুন তাকে এখন এভাবে যেখানে সেখানে ফেলে রাখা যায়?

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠেন মরিয়ম বেগম—যেখানে সেখানে....এ আপনি কি বলছেন?

যা বলছি সত্য কথা। এতদিন মনিরা নাবালিকা বলে তাকে আপন বানিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন, এমন কি তার বাবার বিশাল ঐশ্বর্য ভোগ করে আসছেন–

এসব আপনি বলছেন আলী সাহেব, মনিরার ঐশ্বর্য আমরা ভোগ করে আসছেন।

এসব আপনি কি বলছেন আলী সাহেব—

মনিরা ঐশ্বর্য আমার ভোগ করে আসছি?

তা নয় তো কি? মনিরার বিশাল ধন-সম্পদ এখন কাদের হাতের মুঠায়? চৌধুরী সাহেব নিজেই আত্মসাৎ করে নেননি?

না। তিনি পরের ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল ছিলেন না।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন আসগর আলী সাহেব—একথা আর কেউ বিশ্বাস করলেও আমি বিশ্বাস করি না। মনিরাকে এবং তার মাকে এখানে নিয়ে আসার পেছনে কি ঐ একটিমাত্র কারণ নেই—আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ? চৌধুরী সাহেব সরলতার ভান করে মনিরা আর তার মায়ের সব লুটে নেননি আপনি বলতে চান?

মরিয়ম বেগম স্তব্ধ হয়ে যান, কোন কথাই তিনি আর বলতে পারছেন না। কে যেন তাঁর কণ্ঠনালী টিপে ধরেছে। পাথরের মূর্তির মত নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন।

আসগর আলী সাহেব বলেই চলেছেন–মনিরার বাবা বেঁচে থাকলে পারতেন এসব করতে?

ঠিক সেই মুহূর্তে দমকা হাওয়ার মত কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা—বড় চাচা বলে আমি আপনাকে ক্ষমা করবো না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি সব শুনেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে না আপনার এসব বলতে?

মনিরাকে হঠাৎ এভাবে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমে আশ্চর্য, পরে রাগান্বিত হন আসগর আলী সাহেব। গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন।

মনিরা বলে চলে–আমার মামুজান আপনার মত লোভী ছিলেন না। আমার ঐশ্বর্যের চেয়ে তাঁর হৃদয় অনেক বড় ছিল। সেখানে ধন-সম্পদের মত তুচ্ছ জিনিসের কোন দাম ছিল না। আমি জানি, মামুজান আমার ঐশ্বর্যের এতটুকু নষ্ট করেননি। বরং এতদিন আপনার নিকটে থাকলে....

বিনষ্ট হত, তাই বলতে চাও?

হ্যাঁ, আমাকেও হয়তো পথে দাঁড়াতে হত।

মনিরা!

বড় চাচা, আমি জানতাম না আপনার মন এত নীচু, এত ছোট।

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—মনিরা, সাবধানে কথা বল, উনি তোমার গুরুজন।

উনি নিজের সম্মান বাঁচিয়ে চলতে না পারলে আমি কি করতে পারি? উনি যে আমার বড় চাচা, ভাবতেও ঘৃণা বোধ করছি। আমার শরীরে ওদের রক্ত প্রবাহিত, একথাই আমি ভাবতে পারি না। অনেক দিন আমি উনাকে দেখিনি, উনাকে আমার তেমন করে মনেও পড়ে না। এতদিন একটিবার খোঁজ-খবর নিয়েও জানেননি যে, আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি–আজ এসেছেন বড় চাচার দাবী নিয়ে! এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলল মনিরা।

আসগর আলী সাহেবের দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তিনি চিৎকার করে উঠলেন–সমস্ত শেখানো কথা। ভাবী, এসব মনিরাকে আপনি....

এই তো একটু আগেই আপনি মামীমার কাছে বললেন মনিরা এখন আগের মত কচি খুকী নেই। সত্যিই আমি আগের মত সেই ক্ষুদ্র বালিকা নই, নিজের ভালমন্দ বুঝবার মত জ্ঞান আমার আছে। আপনি আমার গুরুজন হতে পারেন কিন্তু অভিভাবক নন।

মনিরা, তুমি যতই আমাকে অস্বীকার কর কিন্তু আমি তোমার বাবার বড় ভাই।

তা জানি।

আমি এসেছি তোমাকে নেবার জন্য।

কেন?

বয়স তোমার কম হয়নি। তুমি আমাদের বংশের মেয়ে। তোমার কলঙ্ক আমাদের মুখে চুনকালি মাখাবে।

আমি তেমন কিছু করিনি যা আপনাদের মুখে চুনকালি দিতে পারে।

করনি? তোমার মামার ছেলে দস্যু বনহুরকে তুমি স্বামী বলে গ্রহণ করতে চাওনি?

চেয়েছি। এতে আপনাদের মুখে চুন কালি পড়ার কথা নয়।

না, একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না।

আমার বিয়ে যেখানে খুশি হউক বা না হউক তাতে আপনার কিছু আসে যায় না।

মানে?

মানে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে চাই না।

তুমি ঐ দস্যু-চোর-ডাকু লম্পটকে....

হ্যাঁ, আমি তাকেই স্বামী বলে গ্রহণ করব। একটি কথা আপনি ভুল বুঝছেন—সে দস্যু বটে—কিন্তু চোর বা লম্পট নয়।

আবার হেসে ওঠেন আসগর আলী সাহেব, ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি, তারপর বললেন–যার কুৎসা সারা দেশময়, লোকের মুখে মুখে যার বদনাম–

বদনাম নয় বড় চাচা–সুনাম! দস্যু বনহুরের জন্য আজ দেশবাসী পরাধীনতার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তি পেয়েছে। দেশের জন্য সে যতখানি ত্যাগ স্বীকার করেছে, কেউ ততখানি পেরেছে?

ওসব জানতে চাই না মনিরা। আমি বলছি, কিছুতেই একটা দস্যুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না। তুমি নিজে যেতে না চাইলে আমি তোমাকে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হব।

❑

শেষ পর্যন্ত মরিয়ম বেগম মনিরাকে ধরে রাখতে পারলেন না, মনিরার কোন আপত্তি চলল না, আসগর আলী সাহেব জোরপূর্বক নিয়ে গেলেন মনিরাকে।

সরকার সাহেব বাধা দিতে এসেছিলেন, তাঁকে অপমানিত করে সরিয়ে দেয়া হল।

নকীব পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লাঠির আঘাতে আহত করা হলো। চৌধুরী বাড়িতে একটা শোকের ছায়া ঘনিয়ে এলো।

মরিয়ম বেগম কেঁদে কেটে আকুল হলেন। আজ চৌধুরী সাহেব বেঁচে থাকলে আসগর আলী সাহেব এভাবে মনিরাকে নিয়ে যেতে পারতেন? কখনও না, এমন কি মনিরাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত তুলতে পারতেন না।

মরিয়ম বেগম চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে চললেন। এই বিরাট বাড়িখানায় আজ তিনি একা। কেউ নেই তাঁকে এতটুকু সান্ত্বনা দেবার।

বৃদ্ধ সরকার সাহেব তবু যতটুকু পারেন বুঝাতে চেষ্টা করেন, বাড়ির দাস-দাসী সবাই তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে কিন্তু যতই তাঁকে সবাই বুঝাতে চায় ততই তিনি কেঁদে আকুল হন। মনিরাই যে ছিল তাঁর একমাত্র ভরসা। ওর মুখের দিকে তাকিয়েই তিনি আজও বেঁচে আছেন।

সেই মনিরা আজ নেই।

যেদিকে তাকান মরিয়ম বেগম সেদিকেই অন্ধকার দেখেন। ভাবেন মনিরা যদি তার নিজের সন্তান হতো তাহলে কি পারত কেউ তাকে এভাবে জোর করে নিয়ে যেতে? কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেক বেশি দাবী রয়েছে ওদের। আসগর আলী যে তাঁর পিতার বড় ভাই...নানা কথা ভেবে সান্ত্বনা খোঁজেন মরিয়ম বেগম নিজের মনে।

❑

বজরার এক কোণে নিশ্চুপ বসেছিল মনিরা। দৃষ্টি তার নদীর পানিতে সীমাবদ্ধ। কত কি আকাশ পাতাল ভেবে চলেছে সে, এতকাল মামা-মামীমার নিকট কাটিয়ে আজ সে কোথায় চলেছে। যেখানে নেই এতটুকু স্নেহ-মায়া মমতা দেখানোর কেউ—নেই কেউ তার পরিচিত। যদিও আসগর আলী সাহেব তার বড় চাচা হন তবু তাদের কাউকে মনিরা তেমন করে জানে না। অনেক ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে চলে এসেছে মনিরা শহরে। তারপর অবশ্য দু'বার গিয়েছিল দেশের বাড়িতে কিন্তু সামান্য দু'একদিনের জন্য।

আদতে বড় চাচা আর বড় চাচীর ব্যবহার তাকে সন্তুষ্ট করেনি। তাদের পুত্রকন্যাগুলোও কেমন যেন ঈর্ষার চোখে দেখত তাকে। মনিরা ওদের সঙ্গে কোনদিন মন খুলে কথা বলতে পারেনি। মিশতে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে এসেছে।

তারপর তো বহুদিন আর দেশের বাড়িতেই যায়নি মনিরা। মা বেঁচে থাকতে তিনি মাঝে মাঝে গিয়ে বিষয় আশয় দেখাশুনা করে আসতেন। মায়ের মৃত্যুর পর মামুজানই বছরে একবার যেতেন, মনিরার বিষয় আশয় যাতে নষ্ট হয়ে না যায়। মামুজানের মৃত্যুর পর এখন মামীমা আর সরকার সাহেব মনিরার সব দেখাশোনা করছিলেন। নিশ্চিন্তই ছিল মনিরা, হঠাৎ কোথা থেকে বড় চাচার আবির্ভাব হল, কি মতলবে যে তিনি ওকে নিয়ে চলেছেন—তিনিই জানেন।

মনিরাকে ভাবাপন্ন বসে থাকতে দেখে বললেন আসগর আলী সাহেব—মনি কি ভাবছ?

মনিরা কোনো কথা বললো না।

আসগর আলী সাহেব তাঁর বিশাল বাপু নিয়ে মনিরার পাশে এসে বসলেন, তারপর গলার স্বর কোমল করে নিয়ে বললেন—মনিরা, আমি তোমার ভালোর জন্যই নিয়ে যাচ্ছি, কারণ তুমি আমার ছোট ভাইয়ের একমাত্র সন্তান-বংশধর, কাজেই আমার কর্তব্য তোমার মঙ্গল সাধন করা। দেখ মনিরা, তোমার মামীমা তোমাকে যতই ভালবাসুক কিন্তু তার সঙ্গে তোমার রক্তের কোন সংশ্রব নেই। মুখে যতই দরদ দেখাক তার পেছনে রয়েছে স্বার্থ। তোমার বিশাল ঐশ্বর্যের মোহ তাকে----

মনিরা চিৎকার করে তাকে থামিয়ে দিল-চুপ করুন বড় চাচা, আমি ওসব শুনতে চাই না।

তা চাইবে কেন। কিন্তু মনে রেখ, আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছামত যা তা করতে দেব না।

মনিরা একবার ফিরে তাকাল আসগর আলী সাহেবের মুখের দিকে, কোন কথা বলল না।

আসগর আলী সাহেব বলে চললেন—আজ তুমি আমার ওপর রাগ করে মন খারাপ করছ, কিন্তু যখন দেখবে আমি তোমার ভালোই করছি, তখন তোমার এ ভুল ভেঙে যাবে।

মনিরাকে নিয়ে আসগর আলী সাহেবের বজরা যখন ঘাটে ভিড়ল তখন বাড়ির যত মহিলা এসে জড়ো হয়েছে সেখানে। চাচীমা সবার আগে এলেন—কই, মা মনিরা কই!

বজরার সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখে বললেন আসগর আলী সাহেব—ভেব না, তাকে এনেছি। তারপর বজরার মধ্যে প্রবেশ করে বললেন—মনি, উঠে এসো, বাড়িতে পৌঁছে গেছি।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসে রইল।

অগত্যা চাচীমা বজরায় উঠে এলেন—মা মনিরা। মনিরা কোথায় তুমি? ভিতরে প্রবেশ করে বলে ওঠেন-এই যে এখানে চুপটি করে বসে আছ। ওঠো মা—ওঠো, দেখ কোথায় এসেছ!

মনিরা পুতুলের মত উঠে দাঁড়াল, অনুসরণ করল চাচীমাকে।

চাচীমা বললেন—খুব সাবধানে নেমো, দেখো পা পিছলে পড়ে যেও না যেন। দাও, হাতটা আমার হাতে দাও।

মনিরা চাচীমার হাতে হাত না রেখেই নেমে পড়ল বজরা থেকে! কিন্তু একি, অন্দরবাড়িতে প্রবেশ করতেই মনিরার মনটা চড়াৎ করে উঠল।

ব্যাপার কি, উঠানে শামীয়ানা টাঙানো। ঘর-দোর কাগজের ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। একপাশে একটা মঞ্চের মত উঁচু জায়গা লাল কাপড় দিয়ে ঢাকা। চারপাশে নানারকম ফুলঝাড়।

মনিরা আশ্চর্য হয়ে দেখতে দেখতে এগুচ্ছে। চাচীমা আগে আগে চলেছেন, আর পেছনে অগণিত ছেলেমেয়ে আর যুবতী ও বৃদ্ধা। সবাই যেন অবাক হয়ে মনিরাকে দেখছে।

একটা বড় ঘরের মধ্যে মনিরাকে নিয়ে বসানো হল।

চাচীমা মেয়েদের লক্ষ্য করে বললেন—তোমরা সব ওদিকে সেরে নাও, আমি মনিরাকে কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে গোসল করিয়ে নি।

মেয়েরা সবাই মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল।

চাচীমা দরদভরা গলায় বললেন—আহা, মার আমার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। সেই সাত সকালে বজরায় চেপেছে। চলো মা, চলো, গোসল করে চারটা খাবে চল।

আমার ক্ষিদে নেই, গোসল করতে হবে না। গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনিরা।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা—সে কি বাছা, গোসল করবে না, ক্ষিদেও নেই—এ তুমি কি বলছ?

মনিরা কোনো কথা বলল না।

চাচীমা আবার বললেন—চলো মা, লক্ষ্মীটি, চলো। বিয়ের সময় হয়ে এলো বলে.....

চমকে ওঠে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে মনিরা—বিয়ে! কার বিয়ে?

সেকি মা, তোমার বড় চাচা তোমাকে কিছু বলেননি? ও, তুমি লজ্জা পাবে তাই বুঝি উনি বলেননি। শোনো মা—শহীদের সঙ্গে তোমার বিয়ে।

শহীদ! কে শহীদ?

ওমা, সেকি, শহীদকে চেন না? আমাদের ছেলে শহীদ। ঐ যে তোমার সঙ্গে খেলা করত। অবশ্য তোমার চেয়ে বছর সাত-আট বড় হবে আমার শহীদ। কিন্তু শরীরটা যা ওর রোগাটে, তাই এতটুকু হয়ে আছে। দেখলে মনে হয় এখনও বিশ বছর হয়নি। দাড়িগোঁফের নামগন্ধ নেই—বাছার আমার মেয়েদের মত সুন্দর ফুটফুটে মুখ। ঐ তো ওকে মেয়েরা সব গোসল করাচ্ছে–

এমন সময় শোনা যায় একটা মহিলার কণ্ঠস্বর–বড় আম্মা, এসো, শহীদ ভাই কথা শুনছে না, শুধু শুধু পানি মাথায় ঢালছে। শিগগির এসো–

চাচীমা হেসে বললেন—দেখ, এখনও তার ছেলেমি যায়নি। যাই দেখি। বেরিয়ে যান চাচীমা।

মনিরা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে। একটা বাচ্চা ছেলেকে দেখতে পেয়ে হাতের ইশারায় ডাকে—এই শোনো।

বাচ্চা ছেলেটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর এগিয়ে আসে— কি বলছ?

তোমার নাম কি?

ছেলেটা জবাব দেয়— আমার নাম মামুন।

খুব সুন্দর নাম তো তোমার। এই শোনো, এ বাড়িতে কার বিয়ে জান?

বা রে জানি না? আমার মেজো ভাইয়ার বিয়ে?

মেজো ভাইয়া?

হ্যাঁ, শহীদ ভাইয়ার বিয়ে তোমার সাথে, তুমি যে আমাদের ভাবী হবে—

মামুনের কথায় রাগ হয় মনিরার, ঠাস করে কটা চড় বসিয়ে দেয় সে তার গালে।

আচমকা চড় খেয়ে মামুন ভ্যা করে কেঁদে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে চাচীমা, আরও কয়েকজন মহিলা কি হল কি হল করে।

চাচীমা বললেন কি হয়েছে রে মামুন?

আংগুল দিয়ে মনিরাকে দেখিয়ে বলে— ভাবী মেরেছে।

অমনি মনিরা কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে— খবরদার, আবার যদি ভাবী বলবি।

গালে হাত রাখেন চাচীমা ওমা সেকি গো! এই তো একটু পরে কলেমা পড়ে শহীদের বৌ হবে। ভাবী নয় তো কি?

চাচীমা, এসব কি বলছেন আপনারা? বিয়ে আমি এখন করব না।

অবাক কণ্ঠে বললেন চাচীমা— করব না বললেই হলো। তোমার বড় চাচা তোমাকে তাহলে এমনি এমনি নিয়ে এলেন?

তা তিনি যা মনে করেই আনুন না কেন, বিয়ে আমি করব না।

করতে হবে। কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন বড় চাচা। দু'চোখে আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। কঠিন কণ্ঠে বলেন— তোমার কোন আপত্তি শুনব না মনিরা।

মনিরা তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দেয়— আপনি যতই বলুন, বিয়ে আমি করব না। মামুজানকে আপনি লোভী স্বার্থপর বলে অপবাদ দিচ্ছিলেন, এখন বুঝতে পারছি কেন আপনি আমাকে জোর করে নিয়ে এলেন—আমাকে হাতের মুঠায় এনে আমার সমস্ত বিষয় আশয় আত্মসাৎ করতে চান। আপনার পাগল ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে আমাকে জীবন্ত হত্যা

করতে চান। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার এ কুমতলব সিদ্ধ হবার নয়। প্রাণ গেলেও আমি শহীদকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারব না।

তা আয়োজন আমার পণ্ড করে দিতে চাও? মনে রেখ মনিরা, দুনিয়া পাল্টে যেতে পারে তবু তোমাকে আমি পুত্রবধু করবোই। আমার ছোট ভাইয়ের ধন-সম্পদ আমি কারও হাতে তুলে দিতে পারি না—বেরিয়ে যান আসগর আলী সাহেব।

গোটা দিন কেটে গেল মনিরা দানাপানি মুখে দিল না। সন্ধ্যার পর বিয়ে হবে, কিন্তু মনিরা বেঁকে বসলো, বলল—দুটো দিন সময় দিন বড় চাচা, তারপর আপনি যা বলবেন শুনব।

অগত্যা আসগর আলী সাহেব মনিরার কথায় রাজী হলেন, সেদিনের মত বিয়ে স্থগিত রইল।

❑

বনহুর তার পাতালপুরীর গোপন আস্তানায় গা ঢাকা দিয়ে রইল বটে, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তাজকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। পুরোদমে চলল তার দস্যুবৃত্তি।

এর টাকা-পয়সা ওর, অলঙ্কার আর ধনরত্ন লুটে নিয়ে স্তূপাকার করতে লাগল সে তার পাতালপুরীর রত্নাগারে। দস্যু বনহুর যেন প্রলয় কাণ্ড শুরু করেছে।

পুলিশমহলে আবার সাড়া পড়ল।

দেশবাসীর মনে আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে। কেউ নিশ্চিন্ত মনে দিন কাটাতে পারছে না। সবাই দস্যু বনহুরের ভয়ে আড়ষ্ট।

মিঃ জাফরী, মিঃ হারুন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস করে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা দেখলেন দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস এবং তার কিছু সংখ্যক অনুচরকে নিহত করে কোনই লাভ হয়নি বরং দস্যু বনহুরকে ক্ষেপানো হয়েছে তখন একটু ঘাবড়ে গেলেন।

মিঃ মুঙ্গেরী অনেক কষ্টে এই আস্তানার সন্ধান লাভ করেছিলেন। এই আস্তানার সন্ধান করতে গিয়ে কতদিন তাঁর না খেয়ে কেটেছে। কতদিন তাঁকে অনিদ্রায় কাটাতে হয়েছে। গহন বনে লুকিয়ে লুকিয়ে চলাফেরা করতে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছে, এমনকি প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে তবেই মিঃ মুঙ্গেরী দস্যু বনহুরের আস্তানার খোঁজ পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। দস্যু বনহুরের আস্তানা ধ্বংস হলেও তার যে কোন ক্ষতি হয়নি বেশ বুঝা যায়।

একদিকে দস্যু বনহুর, অন্যদিকে ছায়ামূর্তি।

চৌধুরী সাহেবের হত্যারহস্যের সঙ্গে আরও দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে, কোনোটারই সমাধান আজও হলো না। মিঃ জাফরী এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।

সেদিনের বৈঠকে মিঃ হারুন বললেন—আপনারা যতই বলুন—ছায়ামূর্তি যে খান বাহাদুর সাহেবের পলাতক ছেলে মুরাদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিঃ হোসেন বললেন— একথা নির্ঘাত সত্য। সেই মুরাদই এই তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছে।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন— আপনাদের অনুমান সত্যও হতে পারে। পুলিশ রিপোর্টে মুরাদ সম্বন্ধে যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমারও ঐ রকম সন্দেহ হয়।

শঙ্কর রাও বললেন— স্যার, চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করার পেছনে মুরাদের যে হাত ছিল এটা সত্য কিন্তু শয়তান নাথুরাম আর ডক্টর জয়ন্ত সেনকে কেন সে হত্যা করবে? আমি সন্ধান নিয়ে জেনেছি, তাছাড়া আমিও জানি নাথুরাম ছিল মুরাদের দক্ষিণ হাত।

কাজেই তাকে মুরাদ হত্যা করতে পারে না—তাই না মিঃ রাও? কথাটা বলতে বলতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ আলম।

মিঃ রাও বললেন গভীরভাবে চিন্তা করলে তাই মনে হয়।

মিঃ হারুন বললেন— হঠাৎ কর্পূরের মত কোথায় উবে গিয়েছিলেন মিঃ আলম?

মিঃ আলম আসন গ্রহণ করে বললেন— ছায়ামূর্তির সন্ধানে।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন— নিশ্চয়ই কোন নতুন খবর আছে মিঃ আলম?

একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হবে। কেচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি।

কক্ষস্থ সবাই উৎসুক দৃষ্টিতে আলম সাহেবের মুখের দিকে তাকালেন। মিঃ জাফরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। ললাটে গভীর চিন্তারেখা ফুটে উঠেছে।

মিঃ আলম বললেন—আমি মনিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। ইচ্ছা ছিল তার কাছে চৌধুরী হত্যার সন্ধান পাই কিনা। অবশ্য তাকে আমি কোনোরূপ সন্দেহ করিনি। কিন্তু তার সঙ্গে গভীরভাবে আলাপ করে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার মনে একটা ধারণা জন্মেছে নিশ্চয়ই মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত আছে।

মিঃ জাফরী বললেন— মনিরা তার মামুজানের হত্যা রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে, আপনার এরকম সন্দেহের কারণ?

সেই তো বললাম কেঁচো খুঁড়তে সাপের সন্ধান পেয়েছি-সব কথা আপনাকে বলব স্যার, তবে এখানে নয়—একেবারে নির্জনে।

মিঃ আলমের কথা শেষ হতে না হতে কক্ষে প্রবেশ করেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। মুখোভাবে বেশ চাঞ্চল্য ফুঠে উঠেছে। কক্ষস্থ সবাইকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলেন— আমি ছায়ামূর্তির সন্ধান পেয়েছি।

সকলেই একসঙ্গে তাকালেন গোপালবাবুর মুখের দিকে।

গোপালবাবু বললেন—স্যার, কাল গভীর রাতে আমি যখন শঙ্করবাবুর নিকট থেকে বাসায় ফিরছিলাম তখন হঠাৎ আমার সম্মুখে মানে আমার হাত কয়েক দূরে ছায়ামূর্তির আবির্ভাব হয়েছিল।

মিঃ হারুন বললেন—ছায়ামূর্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল, বলেন কি গোপালবাবু। ইচ্ছা করলে আপনি তাকে পাকড়াও করতে পারতেন।

এত যদি সহজ হয়ত মিঃ হারুন তাহলে— বলতে বলতে থেমে গেলেন মিঃ আলম তারপর একবার মিঃ জাফরীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন —স্যার, তাহলে বিফল হতেন না।

মিঃ আলমের কথায় মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ রক্তাভ হল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখোভাব পরিবর্তন করে নিয়ে বললেন— ছায়ামূর্তি অত্যন্ত চতুর বুদ্ধিমান ...

না হলে কি এতগুলো পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সম্মুখে ঘুরে বেড়ায়। আমিও কি কম নাজেহাল হয়েছি এই ছায়ামূর্তির সন্ধানে। কথাগুলো বললেন মিঃ আলম।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— গোপাল, তুমি যখন আমার বাসা থেকে বিদায় নিয়ে গেলে তখন রাত কত ছিল?

গোপাল বাবু মাথা চুলকে বললেন— রাত তখন চারটে।

মিঃ জাফরী বললেন—এত রাতে বন্ধুর কাছ হতে কেন বিদায় হলেন? আর দু'ঘণ্টা কাটানোর মত কি জায়গা ছিল না?

গোপাল বাবু তাকালেন শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে। তারপর বললেন—শংকর আমাকে বাসায় যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল।

মিঃ জাফরী গম্ভীর মুখে তাকালেন মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখে। তারপর বললেন—তাকে কেন আপনি চলে যেতে বললেন।

স্যার, আমার সে কথা গোপনীয়, আমি বলতে পারব না। শঙ্কর রাও সচ্ছভাবে বললেন।

এবার মিঃ জাফরী বললেন—গোপাল বাবু ছায়ামূর্তিকে আপনি কোথায় দেখেছিলেন মনে আছে?

হ্যাঁ মনে আছে। আমার গাড়ি নিয়েই আমি যাচ্ছিলাম। বেশি রাত হবে বলে ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম শঙ্করের ওখানে। একথা সেকথার মধ্যে কখন যে রাত চারটে বেজে গিয়েছিল আমরা কেউ টের পাইনি। দেয়ালঘড়ির ঢং ঢং শব্দে হুঁশ হয়েছিল। শঙ্কর বলল—যা শিগগির বাড়ি যা। আমি বললাম—থেকে গেলে হয় না? কথার ফাঁকে আর একবার মিঃ শঙ্কর রাওয়ের মুখের দিকে তাকান গোপাল বাবু, তারপর বলেন, আমারও ভাল লাগল না তাই বাড়ি চলে গেলাম। আমার বাড়ি যেতে হলে চৌধুরীবাড়ির পেছন পথ বেয়ে যেতে হয়; সেই পথে আমি ছায়ামূর্তিকে দেখেছি— চৌধুরীবাড়ির কবরস্থানের দিকে তাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

মিঃ জাফরী একটা শব্দ করলেন— হুঁ।

সেদিন আরও কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর সবাই উঠে পড়লেন।

❑

মনিরার শূন্যকক্ষে প্রবেশ করে দাঁড়াল দস্যু বনহুর। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। আজ বেশ কিছুদিন এখানে আসতে পারেনি সে, নানা ঝঞ্ঝাটে

ছিল। আজ হঠাৎ তার মনটা কেন যেন অস্থির হয়ে পড়েছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে সেই বেশেই এসে হাজির হলো মনিরার কক্ষে। কিন্তু একি! মনিরা কোথায়? মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল তার।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বারান্দায়, অমনি তাকে দেখে ফেলল নকিব, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো চোর চোর চোর----

সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে ছুটে এলো বাড়ির চাকর বাকর আর বৃদ্ধ সরকার সাহেব। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে সুড়কি, কারও হাতে চাকু, কিন্তু ততক্ষণে বনহুর উধাও হয়েছে।

সকলের সঙ্গে মরিয়ম বেগমও এসে উপস্থিত হলেন সেখানে, সরকার সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন—কোথায় চোর?

সরকার সাহেবের হয়ে ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলে ওঠে নকিব আম্মা, হেঁইয়া কালো ভূতের মত চেহারা কোথায় যেন হাওয়ায় মিশে গেল ঐ যে আপামনির ঘরের বারান্দায়—দেখেছি—

সরকার সাহেব এবং অন্যান্যে মিলে গোটা বাড়িটা তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথায়ও কাউকে দেখতে পেলেন না।

এবার সবাই যার যার ঘরে ফিরে গেল।

মরিয়ম বেগম নিজের ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করলেন, যেমনি তিনি বিছানার দিকে এগুতে যাবেন, অমনি আলমারীর পেছন থেকে বেরিয়ে এলো দস্যু বনহুর।

মরিয়ম বেগম চিৎকার করতে যাবেন, অমনি বনহুর মুখের কালো আবরণ সরিয়ে ফেলল।

মরিয়ম বেগম অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন— মনির।

হ্যাঁ মা, আমিই সেই চোর যাকে এতক্ষণ তোমরা খুঁজে খুঁজে হয়রান পেরেশান হচ্ছিলে। মনিরা কই মা?

মনিরা? তাকে তো তার বড় চাচা দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছে।

কেন?

মনিরা তাদের বংশের মেয়ে, কাজেই মনিরার ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। এতদিন ওকে নাকি আমরা ওর ঐশ্বর্যের লোভে মানুষ করেছি। তোর আব্বা নাকি মনিরার সব ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। আরও কত কি যে বলে গেল তোকে বুঝিয়ে বলতে পারব না বাবা—সে অনেক কথা।

বনহুরের চোখ দুটো আগুনের ভাটার মত জ্বলে ওঠে। অধর দংশন করে বলে— সে বলে গেল আর তুমি নীরবে শুনে গেলে?

তাছাড়া তো কোন উপায় ছিল না বাবা!

বনহুর কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল—এতদিন যে বড় চাচার কোন খোঁজ-খবর ছিল না, আজ সে হঠাৎ গভীর দরদ দেখিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি?

মনিরাকে নিয়ে যাবার সময় তারা জোর করে নিয়ে গেছে। মা কি আমার যেতে চায়?

সব বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে যাবার কোন উদ্দেশ্য আছে। মা আজই আমি চললাম।

কোথায়?

মনিরাকে আনতে।

সেখানে তুই যাবি বাবা? শুনেছি আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে বন্দুকধারী পাহারাদার পাহারা দেয়।

মায়ের কথায় হাসল বনহুর, তারপর বলল—তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা, আমি মনিরাকে তোমার নিকটে এনে দেব। কথা শেষ করে পেছন জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায় বনহুর। মরিয়ম বেগম নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত থ'মেরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

বাগানবাড়ির পেছনে ভেসে ওঠে অশ্বপদ শব্দ খট্ খট্ খট্...

❑

তাজের পিঠে উল্কাবেগে ছুটে চলেছে বনহুর।

কোনদিকে তার খেয়াল নেই। গভীর রাতের অন্ধকারে, বনহুরের জমকালো পোশাক মিশে একাকার হয়ে গেছে।

বনহুর যখন তাজের পিঠে ব- প্রান্তর মাঠ পেরিয়ে ছুটে চলেছে -তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে মহা ধুমধাম শুরু হয়েছে। আজ ভোর রাতে মনিরার বিয়ে আসগর আলী সাহেবের ছেলে শহীদের সঙ্গে।

অনেকগুলো মেয়ে মনিরাকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত।

আসগর আলী সাহেব নানারকমের মূল্যবান অলঙ্কার গড়ে দিয়েছেন মনিরার জন্য। মূল্যবান শাড়ি ব্লাউজ আরও অন্যান্য সামগ্রী। উদ্দেশ্য মনিরাকে খুশি করা।

ওদিকে শহীদকে সাজানো নিয়ে ব্যস্ত যুবকের দল।

শহীদ বার বার হাই তুলছে আর বলছে—কখন বিয়ে হবে? আমার কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

মা পাশেই ছিলেন আদরভরা গলায় বলেন এই তো শুভলগ্ন হল বলে। বিয়ে থা, সময়ক্ষণ দেখে তবে হতে হয়। কথাগুলো বলে কনের ঘরে এলেন তিনি— কি গো, তোমাদের হয়েছে তো?

এমন সময় আসগর আলী সাহেব এলেন সেখানে—এখনও তোমাদের হয়নি? বিয়ের সময় তো হয়ে এলো— ভোর পাঁচটায় বিয়ে; এখন রাত চারটা। সব ঠিক করে নাও, মুন্সী সাহেব বাইরে বিয়ে পড়িয়ে অন্দরবাড়িতে আসবেন।

হলঘরের সম্মুখে বিরাট শামিয়ানার তলায় হাজার হাজার লোক বসে গেছে, বরকে নিয়ে বসানো হলো তাদের মাঝখানে।

বাইরে বরকে প্রথমে বিয়ের কলেমা পড়ানো হবে। মুন্সী সাহেব তার কেতাব খুলে বসলেন।

মেয়েরা সবাই মনিরাকে ছেড়ে বিয়ে দেখতে ছুটল, কেউ দরজার ফাঁকে, কেউ প্রাচীরের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল।

মনিরা একা বসে আছে। বিয়ের সাজে তাকে সাজানো হয়েছে। সমস্ত শরীরে মূল্যবান শাড়ি আর গয়না। ললাটে চন্দনের টিপ। মনিরা ভাবছে— কিছুতেই এ বিয়ে হতে পারে না— যেমন করে হউক, তাকে বিয়ে বন্ধ করতে হবে। এ বাড়িতে আসার পরদিনই বিয়ের আয়োজন করেছিল ওরা। মনিরা নানা কৌশলে বন্ধ করেছিল কিন্তু আজ আর তার কোনো আপত্তি টিকছে না। এখন কি উপায়? কিন্তু এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারে না, জীবন গেলেও না ---- বিষ খাবে সে—

হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, একটা শব্দে ফিরে তাকায় সে। মুহূর্তে মনিরার মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে, অস্ফুট কণ্ঠে বলে সে— মনির, তুমি এসেছ!

বনহুর ঠোঁটের ওপর আংগুলচাপা দিয়ে মনিরাকে চুপ হতে বলে।

মনিরা ততক্ষণে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বনহুরের বুকে, তারপর ব্যস্তকণ্ঠে বলে—শিগগির নিয়ে চল। আমাকে বাঁচাও মনির।

বনহুর এখানে পৌঁছেই বাড়ির আয়োজন দেখে অনুমানে সব বুঝে নিয়েছিল। নিশ্চয়ই তার সন্দেহ সত্যে পরিণত হতে চলেছে। মনিরার বিয়ে দিয়ে তাকে হাতের মুঠোয় ভরতে চলেছেন আসগর আলী সাহেব।

বনহুর অদূরে একটা ঘন ঝোপের আড়ালে তাজকে রেখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এই কক্ষে প্রবেশ করেছে। এই পথটুকু যে কেমন করে সে এসেছে সেই জানে।

প্রায় আধঘন্টা বনহুর সুযোগের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। যেমনি মেয়েরা ওদিকে বিয়ে পড়ানো দেখতে গেছে, অমনি সে আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়েছে।

আর বিলম্ব না করে বনহুর মনিরাকে নিয়ে পেছন জানালার শিক বাঁকিয়ে সেই পথে বেরিয়ে পড়ল।

এবার আর তাদের কে পায়!

বনহুর মনিরাকে নিয়ে তাজের পাশে এসে দাঁড়াল।

আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে তখন করুণ সুরে সানাই বেজে চলেছে।

বনহুর নববধূর সাজে সজ্জিত মনিরাকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। বাঁ হাতে মনিরাকে চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে তাজের লাগাম টেনে ধরল।

বন-প্রান্তর পেরিয়ে উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো তাজ।

মনিরার মনে অফুরন্ত আনন্দ। দক্ষিণ হাতে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্টন করে বলল— চিরদিন এমনি করে যদি তোমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারতাম!

বনহুর আবেগভরা কণ্ঠে বলে—তাই রয়েছ তুমি! মনিরা, কখনো তুমি আমার বুকের মধ্য থেকে দূরে সরে যাবে না।

এই তো আর একটু হলেই কোথায় থাকত তোমার মনিরা?

হয়ত তোমার চাচার ছেলের বৌ হতে, এই তো।

না। তার পূর্বে আমি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আয়োজন করে নিয়েছিলাম...

মনিরা! বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে বসেই মনিরাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে জড়িয়ে ধরল।

মনিরা বুঝল, এখন তার কিছু বলা উচিত হবে না। হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে যেতে পারে। তাই নিশ্চুপ রইল।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন চৌধুরীবাড়ি পৌঁছল তখন রাত প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। যদিও পাখিরা এখনও বাসা ছেড়ে বেরিয়ে যায়নি, তবু

কলরব শুরু করেছে। নতুন দিনের মধুর পরশে মন তাদের খুশীতে ভরে উঠেছে। সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে ওরা।

বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে মায়ের সম্মুখে হাজির হল— মা, এই নাও তোমার মনিরাকে।

নিদ্রাহীন কোটরাগত চোখ দুটি তুলে তাকালেন মরিয়ম বেগম। মনিরাকে দেখে উচ্ছ্বাসিত আনন্দে বলে উঠলেন— এনেছিস বাবা, আমার হারানো রত্ন তুই ফিরিয়ে এনেছিস? কিন্তু আমার মায়ের এ বেশ কেন?

ভয় নেই মা, তুমি যা ভাবছ তা হয়নি। আর একটু বিলম্ব হলে হয়ত---

--

হায় হায়, একি সর্বনাশটাই না হত। মনি যে একটা মতলব এটে তবেই মনিরাকে নিয়ে গেছেন আসগর আলী সাহেব তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। বাবা মনির, শোন, একটা কথা শোন্, সরে আয় আমার পাশে।

বনহুর মায়ের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়— বল মা?

ওরে, তোকে আর আমি ছেড়ে দেব না। আজ মনিরার এই বিয়ের সাজ আমি বৃথা নষ্ট হতে দেব না।

মা!

হ্যাঁ, মনিরাকে তোর বিয়ে করতে হবে।

হ্যা!

মনির, আজ তোর কোনো আপত্তিই আমি শুনব না। মনিরাকে তোর বিয়ে করতেই হবে, নইলে আমি আজই আত্মহত্যা করব।

এ তুমি কি বলছো মা? বনহুর একবার মায়ের মুখে আর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকায়।

মনিরার দু'চোখে অশ্রু ছলছল করছে। নিষ্পলক নয়নে এতক্ষণ বনহুরের দিকে তাকিয়ে ছিলো মনিরা, বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই দৃষ্টি নত করে নেয় সে।

বনহুর মায়ের দিকে তাকাল—তারপর স্তব্ধকণ্ঠে বলল— মনিরার সুন্দর জীবনটা তুমি নষ্ট কর না মা।

আমি জানি মনি তোকে ভালোবাসে, তোর সঙ্গে বিয়ে হলে সে অসুখী হবে না।

আমি যে মানুষ নামের কলঙ্ক। লোকসমাজে আমার যে কোন স্থান নেই। ভুল কর না মা, তুমি ভুল করো না—বনহুর মায়ের বিছানায় বসে পড়ে দু'হাতে নিজের মাথার চুল টানতে লাগল। অধর দংশন করতে লাগল সে।

মনিরা পাথরের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা কথাও তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

মরিয়ম বেগম পুত্রের পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ান, পিঠে হাত রেখে বলেন— যত কথাই বলিস না কেন মনির আমার কথা তোকে রাখতেই হবে। বিয়ে তোকে করতেই হবে— করতেই হবে। নইলে আমি মাথা ঠুকে মরব--- মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করলেন।

বনহুর আর স্থির থাকতে পারল না, দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মাকে ধরে ফেলল— চমকে উঠলো বনহুর, মায়ের ললাটে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল সে— একি করলে মা!

না না, ছেড়ে দে আমায়; আমি আর বাঁচতে চাই না। মনিরাকে যদি অন্যের হাতে তুলে দিতে হয় তবে আমার মৃত্যুই ভাল:..

মা!

মনির, ওকে তুই বিয়ে কর।

বনহুর মাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে তাকাল মনিরার দিকে। মনিরার গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা। নীরব ভাষায় যেন বলছে—ওগো, তুমি সদয় হও। ওগো, তুমি সদয় হও! একটিবার ফিরে তাকাও দুনিয়ার দিকে..

বনহুর মনিরার দিকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তাকিয়ে বলে ওঠে—তোমার কথাই সত্য হউক মা, মনিরাকে আমি বিয়ে করব।

এতক্ষণে মরিয়ম বেগমের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি আঁচলে ললাটের রক্ত মুছে ফেলে বললেন— আমাকে বাঁচালি বাবা। দাঁড়া, তুই যেন আবার পালিয়ে যাসনে—মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান।

সরকার সাহেব তাঁর নিজের কামরায় ঘুমিয়ে ছিলেন। মরিয়ম বেগম কক্ষে প্রবেশ করে ডাকেন—সরকার সাহেব, উঠুন তো?

ধড়মড় করে উঠে বসেন সরকার সাহেব, চোখ মেলে তাকিয়ে অবাক হন। হঠাৎ রাতের বেলায় বেগম সাহেবা, কারণ কি? ঢোক গিলে বললেন—আপনি!

মরিয়ম বেগম বললেন— আমার সঙ্গে আসুন দেখি।

কি হয়েছে বেগম সাহেবা?

আসুন, পরে বলছি।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে চলেন, তাঁকে অনুসরণ করেন বৃদ্ধ সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম নিজের কক্ষে প্রবেশ করে, ডাকেন— আসুন সরকার সাহেব।

বনহুরের চোখে-মুখে বিস্ময়, মা তার কি করতে কি করে বসলেন। সরকার সাহেবকে আবার কেন ডাকলেন ভেবে পায় না সে।

ততক্ষণে সরকার সাহেব কক্ষে প্রবেশ করে বনহুরকে দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন। এ কে? বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, কোমরের বেল্টে রিভলভার— সরকার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন। তিনি তো কোনদিন বনহুরকে দেখেননি তাই ঘাবড়ানোটা স্বাভাবিক। তারপর মনিরাকে দেখতে পেয়ে যেমন বিস্মিত তেমনি আনন্দিত হলেন। কিছু বুঝতে না পেরে তাকলেন মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললেন— সরকার সাহেব, একে চিনতে পারেননি? পারবেনই বা কি করে! ভাল করে একবার ওর দিকে চেয়ে দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা।

সরকার সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলেন। তারপর বললেন— কই না, ওকে তো আমি কোনদিন দেখিনি।

এবার মরিয়ম বেগম বললেন— আমার মনিরকে আপনার মনে আছে সরকার সাহেব?

তা থাকবে না? মনির— সে যে আমাদের সকলের নয়নের মনি ছিল বেগম সাহেবা।

সেই নয়নের মনি, আমার প্রাণের প্রাণ মনির আপনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে।

অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন সরকার সাহেব— মনির!

হ্যাঁ, আমার মনির।

বৃদ্ধ সরকার সাহেবের চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়। দু'হাত বাড়িয়ে বনহুরকে বুকে টেনে নেন। বনহুর নীরবে সরকার সাহেবের কাঁধে মাথা রাখে।

সরকার সাহেবের সেকি আনন্দ! উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বললেন— কোথায় ছিলে বাবা তুমি এতদিন? তা ছাড়া মা মনিরাই বা-----

মরিয়ম বেগম বললেন— সব পরে বলবো আপনাকে সরকার সাহেব। আজ খুব তাড়াতাড়ি একটা কাজ করতে হবে।

বলুন বেগম সাহেবা?

মনিরাকে ওর বড় চাচা তার ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিলেন— মনির সেই বিয়ের মঞ্চ থেকে মাকে আমার নিয়ে এসেছে। আমি চাই মনিরের সঙ্গে এক্ষুণি মনিরার বিয়েটা শেষ করতে।

এক্ষুণি!

হ্যাঁ আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয় সরকার সাহেব। রাত ভোর হবার আর দেরী নেই, তার পূর্বেই আমি ওদের বিয়ে দিতে চাই। আমি জানি আপনি আরও অনেক জায়গায় বিয়ে পড়িয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার ভুল হবে না।

তা হবে না কিন্তু এত তাড়াহুড়া করে—

আর কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না সরকার সাহেব। দেখছেন না মনিরার শরীরে বিয়ের পোশাক—

সরকার সাহেব ওজু বানিয়ে কেতাব নিয়ে আসলেন। মনিরা আর দস্যু বনহুরকে পাশাপাশি বসিয়ে বিয়ের কলেমা পাঠ করলেন।

মরিয়ম বেগম নীরবে আশীর্বাদ করে চললেন।

ওদিকে ভোরের আজানধ্বনি ভেসে এলো—আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

দস্যু বনহুরের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল মনিরার।

পাখিরা তখন নীড় ছেড়ে মুক্ত আকাশে ডানা মেলেছে।

বনহুর মনিরার হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলল— মনিরা এ তুমি কি করলে?

সবচেয়ে যা আমার মঙ্গলময় তাই করলাম।

সুখী হবে কি?

মনিরা স্বামীর বুকে মুখ লুকিয়ে বলল—আমার মত সুখী কে!

বনহুর আর মনিরাকে একা রেখে, বেরিয়ে গিয়েছিলেন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব। বিয়ের পর ওদের দু'জনের কাছে দু'জনের যা বলবার থাকে বলে নিক ওরা।

এবার বনহুর বিদায় চাইল মনিরার কাছে— আসি তবে?

এসো। ছোট্ট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো মনিরার মুখ থেকে।

স্বামীর বাহুবন্ধন থেকে সরে দাঁড়াল মনিরা।

বনহুর একবার মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

❑

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে গোপনে সব খুলে বললেন বারবার অনুরোধ করলেন—দেখুন সরকার সাহেব, এ কথা যেন কোনদিন কাউকে বলবেন না। শুধু সাক্ষী রইল আল্লাহ আর আপনি ও আমি।

সরকার সাহেব বললেন— আমি কোনদিন কারও কাছে এ কথা প্রকাশ করব না।

এখানে যখন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব কথাবার্তা বলছিলেন, তখন আসগর আলী সাহেবের বাড়িতে ভীষণ কাণ্ড-পাত্রী উধাও হয়েছে।

গোটা পাড়া তন্নতন্ন করে খোঁজা হল—কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না।

আসগর আলী সাহেব তো রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন। তাঁর এতবড় আয়োজন সব পণ্ড হয়ে গেল। তাছাড়া মনিরা গেল কোথায়—এই চিন্তাই তাঁকে অস্থির করে তুলল। বাড়ির সকলকে ধমকানো শুরু করলেন কেন তাকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যে চলে গেছে তাকে কি আর এত সহজে পাওয়া যায়! আসগর আলী সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী মনিরার বড় চাচীর অবস্থাও তাই। অনেক আশা করেই তিনি আজ মনিরার সঙ্গে পুত্রের বিয়ে দিতে চলেছিলেন।

আসগর আলী সাহেব আর তাঁর স্ত্রীর যত রাগ গিয়ে পড়ল মনিরার মামীমা মরিয়ম বেগমের ওপর। নিশ্চয়ই তাঁরই কোন চক্রান্তে মনিরা পালিয়েছে। কিন্তু মনিরা যেখানেই থাক তাকে খুঁজে বের করতেই হবে। তার বিয়েও হবে শহীদের সঙ্গে। মনিরা তাদেরই মেয়ে; কোনো অধিকার নেই তার ওপর চৌধুরীবাড়ির কারও।

শহীদ তো হাউমাউ করে কাঁদা শুরু করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে বিলাপের মত বলছে—আমার বৌ কোথায় পালিয়েছে? আমার বৌ কে নিয়ে গেছে? আমি তার মাথা আস্ত রাখব না। এমনি নানারকম আবোল তাবোল বলতে শুরু করেছে শহীদ।

আসগর আলী সাহেবের স্ত্রী পুত্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— কাঁদিস না বাপু, মনিরা তোরই বৌ, কে তাকে নিতে পারে। কালই আমি তোর আব্বাকে চৌধুরীবাড়ি পাঠাব, কাঁদিস না বাপ।

আসগর আলী সাহেব তখনই লোক পাঠালেন চৌধুরীবাড়িতে—যা দেখে আয় মনিরা সেখানে গেছে কিনা।

কেউ কেউ বলল মেয়ে মানুষ রাতারাতি যাবে কি করে? হয়তো পাড়ার কোথাও লুকিয়ে আছে। কিংবা কোথাও পানিতে ডুবে আত্মহত্যা করেনি তো?

আঁতকে উঠলেন আসগর আলী সাহেব, বললেন— হতেও পারে!

গ্রামের সমস্ত খাল-বিল-পুকুর খুঁজে দেখতে শুরু করলেন। জাল ফেলে দেখলেন কিন্তু কোথাও মনিরাকে পাওয়া গেল না। জীবিত কিংবা মৃত যে কোন অবস্থায় ওকে পেতেন তাতেই খুশি হতেন আসগর আলী সাহেব। তাঁর মনের বাসনা মনিরার সমস্ত বিষয় আসয় আত্মসাৎ করা।

❑

চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থান। ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন জায়গাটা। আম কাঁঠালের সারি একপাশে জামরুল আর জলপাই গাছ। পাশেই একটা চাঁপাফুলের গাছ, তারই তালায় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছেন চৌধুরী সাহেব।

কিছুক্ষণ পূর্বে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে ঘন মেঘের চাপ জমাট বেঁধে রয়েছে। মাঝে মাঝে পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়ছে শুকনো পাতার ওপর। তারই মৃদু শব্দের মধ্যে শুনা যাচ্ছে ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত আওয়াজ।

বৃষ্টি ধরে গেছে অনেকক্ষণ তবু আকাশে ঘন কালো মেঘের ফাঁকে বিদ্যুতের চমকানি। যেন অশ্বারোহীর হাতের চাবুকের মত এখনও ছুটে বেড়াচ্ছে—

রাত গভীর। গোটা শহর ঝিমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে দূর থেকে অজানিত ভ্রমণকারী মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

এমন সময় চৌধুরীবাড়ির পেছনে কবরস্থানের পথ বেয়ে এগিয়ে এলো ছায়ামূর্তি। ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছে। বিদ্যুতের আলোতে বড় অদ্ভুত লাগছে তাকে।

আম-কাঁঠালের ছায়া এসে থমকে দাঁড়ালো ছায়ামূর্তি। আবার বৃষ্টি নামলো। খুব বেশি নয় টুপ টুপ ঝরছে কোনো শোকাতুরা জননীর অশ্রুবিন্দুর মত।

ছায়ামূর্তি আরও কয়েক পা এগুলো। ঠিক চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাপড়ের ভেতর থেকে বের করলো একটা ধারালো অস্ত্র। এবার চৌধুরী সাহেবের কবরের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ছায়ামূর্তি। তারপর দ্রুত মাটি সরাতে শুরু করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কয়েকজন পুলিশসহ মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির সম্মুখে আচমকা এসে দাঁড়ালেন, রিভলভার উদ্যত করে গর্জে উঠলেন— কে তুমি?

ছায়ামূর্তি ধারালো অস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াল।

জমকালো আলখেল্লায় তার সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত।

মিঃ জাফরী এবং পুলিশ বাহিনীর হাতে উদ্যত রিভলভার। মিঃ হারুন টর্চের আলো ফেললেন ছায়ামূর্তির মুখে।

টর্চের তীব্র আলোতে আলখেল্লার মধ্যে দু'টি চোখ শুধু জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠল।

মিঃ জাফরী ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিতে আদেশ দিলেন।

মিঃ হারুন স্বয়ং ছায়ামূর্তির হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে পুলিশ ফোর্স তাকে ঘিরে ধরেছে।

❑

ছায়ামূর্তিকে বন্দী অবস্থায় পুলিশ অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। সকল অফিসার একত্রিত হয়ে ছায়ামূর্তিকে ঘিরে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকের হাতেই গুলিভরা রিভলভার। সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দাঁড়িয়ে রয়েছে একপাশে। মিঃ শঙ্কর রাও এবং মিঃ গোপাল উপস্থিত রয়েছেন সেখানে। সকলেরই চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ— কে এই ছায়ামূর্তি?

মিঃ জাফরী স্বয়ং এগিয়ে এলেন ছায়ামূর্তির পাশে। কালো আলখেল্লায় ঢাকা চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে বললেন—কে তুমি ছায়ামূর্তি—জবাব দাও?

সঙ্গে সঙ্গে ছায়ামূর্তি তার মুখের আবরণ উন্মোচন করে ফেলল।

কক্ষে একটা বাজ পড়লেও এভাবে সবাই চমকে উঠতো না, সবাই বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে তাকালেন। অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলেন মিঃ শঙ্কর রাও —মিঃ আলম! আপনি ছায়ামূর্তি।

মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল সবচেয়ে বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন— প্রথম থেকেই আমি এই রকম একটা সন্দেহ করেছিলাম।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— মিঃ আলম, আপনিই তাহলে খুনী।

খুনী যে আমি নই, এ কথা বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন কি? করবেন না নিশ্চয়ই। নিজে খুনী সেজেই আমি আসল খুনীর সন্ধান করছিলাম এবং সফলতা লাভ করেছি।

কক্ষে আবার একটা চঞ্চলতা দেখা দিল। মিঃ জাফরীর মুখমণ্ডল অনেকটা প্রসন্ন হয়ে এসেছে। মিঃ আলমের হাত হাতকড়া লাগানোর জন্য একটু অস্বস্তি বোধ করছিলেন তিনি। কিন্তু চট করে হাতকড়া খুলে দেবার অনুমতিও দিতে পারছিলেন না। সবাই নিজ নিজ রিভলভার সংযত করে খাপের মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। পুলিশরাও অফিসারগণকে অস্ত্রসংবরণ করতে দেখে তারাও নিজ নিজ রাইফেল নামিয়ে নেয়। মিঃ জাফরী নিজ হাতে মিঃ আলমের হাতের হাতকড়া খুলে দেন।

কক্ষস্থ সবাই ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে তাকালেন। তাঁরা জানতে চান কে এই খুনী যে একসঙ্গে তিন তিনটা খুন করতে পারে।

মিঃ আলম বলে চললেন— প্রথমতঃ চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী এবং ডক্টর জয়ন্ত সেন ও ভগবৎসিংবেশি নাথুরামের হত্যাকারী এক নয়। দ্বিতীয়তঃ চৌধুরী সাহেবের হত্যাকারী ডক্টর জয়ন্ত সেন। তৃতীয়তঃ চৌধুরী সাহেবকে হত্যা করতে জয়ন্ত সেনকে বাধ্য করেছিলো ভগবৎসিংবেশী নাথুরাম এবং এদের সবাইকে পরিচালিত করেছিল খান বাহাদুর সাহেবের ছেলে মুরাদ।

মিঃ জাফরী কঠিন কণ্ঠে বলে ওঠেন—তাহলে ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামকে মুরাদই হত্যা করেছে বলে মনে করেন?

মিঃ আলম একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন— না, মুরাদ হত্যাকারী নয়, তবে তার নির্দেশেই এসব ঘটেছে এবং তার উদ্দেশ্য ছিলো চৌধুরী সাহেবকে পরপারে পাঠিয়ে তাঁর একমাত্র ভাগিনী মিস মনিরাকে হস্তগত করা; কিন্তু সে আশা তার সফল হয়নি। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে!

মিঃ হারুন বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করে ওঠেন— কি বললেন মুরাদকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

হ্যাঁ মিঃ হারুন আপনি স্বয়ং তাকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তার মানে।

মানে ভগবৎসিংবশী নাথুরামের বাড়িতে তার আত্মীয়ের বেশে জয়সিংকে গ্রেফতারের কথা আপনার স্মরণ আছে ইন্সপেক্টার?

হ্যাঁ, জয়সিং নামে এক ব্যক্তিকে আমরা সেদিন গ্রেপ্তফতর করেছিলাম। এখনও সে জেলে আটক রয়েছে।

সেই জয়সিং খান বাহাদুর সাহেবের একমাত্র সন্তান মুরাদ।

মিঃ জাফরী বলে ওঠেন— মুরাদ তাহলে বন্দী হয়েছে, যাক তাহলে একটা দিক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। কিন্তু আপনি রাতদুপুরে চৌধুরী সাহেবের কবরে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কেন মাটি সরাচ্ছিলেন জানতে পারি কি?

আমি চৌধুরী সাহেবের কবর থেকে তাঁর একখানা হাড় সংগ্রহের চেষ্টা করছিলাম—কারণ আমি পরীক্ষা করে জানতে চাই তাঁকে কি ধরনের বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। হাড় সংগ্রহ করতে আমাকে কবরস্থানে গোপনে যেতে হয়েছিল।

এতক্ষণে কক্ষস্থ সকলের মুখমণ্ডল প্রসন্ন হলো।

হঠাৎ জাফরী এবার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করে বসলেন— মিঃ আলম, এবার বলুন ডক্টর জয়ন্ত সেন আর নাথুরামের হত্যাকারী কে?

হঠাৎ মিঃ আলম হো! হো! করে হেসে উঠলেন, তার সুন্দর মুখমণ্ডল দীপ্ত হলো, পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে পড়লেন তিনি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে

বললেন—পিতার হত্যাকারীকে পুত্র হত্যা করেছে। ডক্টর জয়ন্ত সেন ও শয়তান নাথুরামকে হত্যা করেছে দস্যু বনহুর।

সকলেই একসঙ্গে অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠেন—দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ আসল হত্যাকারী দস্যু বনহুর।

মিঃ জাফরী মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন, বললেন—সত্যি, আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না। মিঃ আলম, আপনি যে এত সুন্দরভাবে এই হত্যারহস্য উদঘাটন করেছেন তার জন্য আপনাকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কক্ষস্থ অন্যান্য অফিসার মিঃ আলমের সাথে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

মিঃ আলম কিন্তু তাঁর ছায়ামূর্তির ড্রেস পূর্বেই খুলে ফেলেছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবার আমি বিদায় গ্রহণ করছি। গুড নাইট।

কেউ কোনো কথা উচ্চারণ করার পূর্বেই মিঃ আলম কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ হারুনের দৃষ্টি মিঃ আলমের পরিত্যক্ত ছায়ামূর্তির আলখেল্লাটার উপরে গিয়ে পড়ল। তিনি হেসে বললেন—মিঃ আলমের ওটার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই ফেলে গেলেন।

মিঃ শঙ্কর রাও উঠে গিয়ে আলখেল্লাটা হাতে উঠিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলেন।

সবাই অবাক হয়ে দেখছেন, হঠাৎ মিঃ জাফরী বলে ওঠেন—ওটা কি? একখণ্ড কাগজ যেন পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে আলখেল্লার গায়ে।

তাইতো! মিঃ শঙ্কর রাও কাগজের টুকরাখানা আলখেল্লা থেকে খুলে নিলেনই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেহারার ভাব বদলে গেল, বিস্মিতকণ্ঠে বললেন একি! দস্যু বনহুরই মিঃ আলম ও ছায়ামূর্তি।

কি বলছেন! মিঃ জাফরী তাড়াতাড়ি শঙ্কর রাওয়ের হাত থেকে কাগজটা নিয়ে পড়ে দেখলেন, তাতে লেখা রয়েছে— 'দস্যু বনহুর'।

মিঃ জাফরী থ' মেরে গেলেন। তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

আর সবাই নির্বাক, নিশ্চুপ, হতভম্ব। সহসা মিঃ হারুন চিৎকার করে বললেন—পাকড়াও করো, মিঃ আলমকে পাকড়াও করো ---- গ্রেফতার করো .....

সমস্ত পুলিশ উদ্যত রাইফেল হাতে ছুটল।

কিন্তু মিঃ আলমবেশি দস্যু বনহুর তখন কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে।